Registered

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

এক

শ্রমজীবী জনসমষ্টির স্বদেশ বলে কোন বস্তুই নেই, যা তাদের আদপেই নেই তা থেকে আমরা তাদের বঞ্চিত করতে পারি না। যেহেতু সর্বহারাদের সর্বাগ্রে রাজনৈতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির অগ্রচারী শ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে হবে একক জাতিরূপে, সে অর্থে তাদের চারিত্রবৈশিষ্ট্যই জাতীয়—

—কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো

গণবার্তা

সম্পাদকীয়	১
ভারতের জনজীবনে ...অপকর্ম	১
দেশে-বিদেশে	২
আর এস এসের বিপদ নানাভাবে বেড়ে চলেছে	৩
তরুণতীর্থের শিশুকিশোর উৎসব...	৪
কম. মিহির সেনগুপ্ত প্রয়াত	৫
ধানের অভাবী বিক্রি	৬
আবাস যোজনার দুর্নীতি নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য তরজা	৭
স্যান্টোস, ব্রাজিল ও পেলে	৮

70th Year 22nd Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 7th January, 14th January 2023

সম্পাদকীয়

ফ্যাসিস্ট হিন্দুরাষ্ট্র গঠন করাই সংঘ পরিবারের লক্ষ্য

আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকে লক্ষ্য করে সংঘ পরিবার এবং তাদের রাজনৈতিক দল বিজেপি সংবিধানের বহুত্ববাদী ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা-জাতপাত নিরপেক্ষ চরিত্র ধ্বংস করার পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সংঘ পরিবার সুনিশ্চিত পদক্ষেপে গণতন্ত্র ধ্বংসকারী হিন্দুরাষ্ট্র গঠনের দিকেই শুধু এগিয়ে চলছে না। প্রয়োজনে শাসনক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠিত প্রধান ব্যক্তিগণ, নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সারা দেশ জুড়ে একাধারে মুসলমান দলিত সহ সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ বিষ ছড়াতে সোচ্চার হয়েছে। অক্টোপাসের মতো রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তর বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে অর্থনীতি তো বটেই, সমাজের প্রতিটি অংশকে আক্রমণ করে গণতন্ত্রের সামান্যতম উপাদানগুলিকেও বিকল করে চলেছে।

অথচ প্রধানমন্ত্রী নিজে স্বেচ্ছাচারীর মতো নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে দেশের সংবিধান স্বীকৃত স্বয়ংশাসিত প্রশাসনিক সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণ বিধি লঙ্ঘন করছেন। শুধু লঙ্ঘন নয়, এসব সংস্থাকে বিরোধী দল ও গণতন্ত্রপ্রিয় বিবেকবান ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের ক্রমাগত আক্রমণ করতে উদ্যত।

অতিমারির বিশ্বব্যাপী আগ্রাসনের কালে আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প, ব্রাজিলের বোলসোনারো, হাঙ্গেরীর ভিক্টর ওর্বান বা ইজরায়েলের নেতানিয়াহু প্রমুখ স্বেচ্ছাচারী আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের অন্তরঙ্গ সুহৃদ নরেন্দ্র মোদীর নাম ঐকতানে উচ্চারিত হত। উগ্র বর্ণবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী ঐ বাহিনী সারা দুনিয়া দাপিয়ে বেড়িয়েছে।

বোলসোনারো এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রজাতন্ত্র দিবসে আমন্ত্রণও করেছেন নরেন্দ্র মোদী। ট্রাম্প প্রজাতন্ত্র দিবসে না আসতে পারলেও, 'নমস্তে ট্রাম্প' অনুষ্ঠানে মোদীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়েছেন আহমেদাবাদে। আর বোলসোনারোর মতো ফ্যাসিস্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অলংকৃত করেছেন ২০২০ সালে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস।

সাধারণ নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প পরাজিত হবার পর তাঁর অনুগামী লুম্পেনবাহিনী, আমেরিকায় তাণ্ডব করলেও উচ্চৈস্বরে নিন্দা করেননি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী। না করলেই নয় এমনভাবে মৃদু ভর্ৎসনা করেছেন। আর আজ সেই স্বেচ্ছাচারী বোলসোনারো বামপন্থী ইনশিও লুলা দ্য সিলভার কাছে পরাজিত হওয়ার পর যখন বোলসোনারোর লুম্পেন বাহিনী ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্ট, সংসদ আক্রমণ করেছে, তখন চরম ভণ্ডামীর পথ নিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। ডিগবাজি খেয়ে গণতন্ত্র ধ্বংসের নিন্দা করেছেন। কপট প্রতিবাদ।

প্রশাসনিক প্রধানের এই ভণ্ডামীর পাশাপাশি কিন্তু সংঘ পরিবারের প্রধান মোহন ভাগবত বা উপরাষ্ট্রপতি জগদীশ ধনকড় গণতন্ত্র হত্যাকারী দাঁত নখ লুকিয়ে রাখেন নি। আর এস এস প্রধান মোহন ভাগবত অভূতপূর্ব আগ্রাসী সুরে হিন্দুত্ববাদী জঙ্গিবাদকে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন। আর উপরাষ্ট্রপতি সংবিধানকে ধ্বস্ত করার দিশা বাতলে দেবার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। সাংবিধানিক পরিসরে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও, তিনি সংসদ ও বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংবিধানকে বদলে দেবার পক্ষে, সংবিধানের বহুত্ববাদী ফেডেরাল কাঠামোকে ধ্বংস করার পক্ষে জোর সওয়াল করছেন।

একাধারে মিথ্যাচার, গিমিক, একের পর এক জুমলা নির্বাচন কমিশনকে পঙ্গু করে, একের পর এক রাজ্যে বিরোধী দলের বিধায়কদের অর্থলোভ না হলে ইডি সিবিআই আইটির ভয় দেখিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার মাধ্যমে সংবিধান বদলে দেবার প্রক্রিয়ার বাস্তব অনুশীলন চলছে। চলছে বিচারব্যবস্থার উপর আধিপত্য স্থাপনের ধারাবাহিক অপচেষ্টা। তাসত্ত্বেও শিরদাঁড়া সোজা করে গণতন্ত্র রক্ষা করার চেষ্টা চলছে শীর্ষ আদালতে। তাই শীর্ষ আদালতের প্রাধান্য ধ্বংস করতে পারলে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা- বিরোধী শেষ দেওয়ালটা ভেঙে ফেলা যায়। নির্দ্বিধায় সেই পথে এগোচ্ছে সংঘ পরিবার এবং ভারত সরকার।

ভারতের সুদীর্ঘকালীন ঐতিহ্য এবং ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে কর্পোরেট কোম্পানিগুলির অতি মুনাফা নিশ্চিত করার সুবন্দোবস্ত করে চলেছে মোদী সরকার। দেশের ধনী এবং অতি ধনী উচ্চবর্ণের হিন্দুরা হয়তো উল্লসিত। কিন্তু তারা নেহাতই সংখ্যালঘিষ্ঠ। সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্রমানুষ সসম্মানে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলছেন। মোদী বিরোধী প্রতিবাদী রাজনীতির কেন্দ্রে এই প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের জনজীবনে চরম অনিশ্চয়তা সংগ্রামী ঐক্যবদ্ধ জনগণই রুখে দেবে সব অপকর্ম

ভারতের সাধারণ জীবন এমন দুরবস্থায় অতীতে কখনও পড়েছে কিনা তা, গভীর গবেষণার বিষয়। স্বাধীনোত্তর দেশে তো এমন অব্যবস্থার কোনও নজির নেই। জাতীয় কংগ্রেস দলের দীর্ঘকালীন শাসনে সদ্য স্বাধীন ইংরেজ ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন এবং অত্যাচারে নিঃস্ব একটি জাতিকে আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে তাল মেলানোর প্রচেষ্টায় অনেক সময়েই তাল কেটেছে। ভারতের মতো একটি পুঁজি-অনুন্নত দেশে অবাধ গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়ে লোক সাধারণের স্বার্থ রক্ষার কাজেও নানাবিধ ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। স্বাধীন দেশে প্রায় ত্রিশ বছরের শাসন প্রণালীর অভ্যন্তরে স্বৈরতান্ত্রিক ঝোঁক এমনকি, এক নেত্রী ভিত্তিক স্বৈরশাসনের প্রবর্তনও ঘটেছে। বিপত্তি বেড়েছ অনেক সময়। পিছিয়ে থাকা একটি মূলত কৃষিনির্ভর সমাজে পুঁজিবাদের বিকাশ ও অগ্রগমন নিশ্চিত করতে গিয়েও প্রবল বিপত্তি ঘটেছে। সাধারণ মানুষ প্রতিবাদী বিক্ষোভে পথে নেমেছেন দেশ জুড়ে।

আন্তর্জাতিক পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকটের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারতের বুকেও উত্তরণ-অসম্ভব অর্থনৈতিক সংকটের সুকঠিন চাপ অনুভূত হয়েছে। অনেকবার অর্থনৈতিক সংকট রাজনৈতিক সংকটে রূপান্তরিত হয়ে লোক সাধারণের জীবন বিপন্ন করেও তুলেছে। নানা সময়ে ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হানাহানিও ঘটেছে। কেন্দ্রীয় এবং বেশ কিছু রাজ্যের সরকার অপরাধীদের সঙ্গে আপস করেছে কিংবা সরাসরি মদত দিয়েছে।

নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। বেকারত্বের অবসানে যথাযথ পথ অনুসরণ করাও হয়নি। শিক্ষার প্রসার ঘটেছে শম্বুক গতিতে। বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও নানাসময়ে অবিমৃষ্যকারিতা হয়েছে। আবার একসময় আন্তর্জাতিক পুঁজিব্যবস্থার চাপে ও দেশের অভ্যন্তরে গজিয়ে ওঠা বড় বড় পুঁজিমালিকদের অতি আগ্রহে লগ্নিপুঁজির সহায়ক ও স্বার্থপূরণকারী নয়া উদারবাদী ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। লোকসাধারণের জীবনে সমস্যা আরও বেড়েছে। এসবই সত্যি। অনস্বীকার্য সত্য।

কিন্তু বিগত ২০১৪ সালের পর থেকে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন প্রণালীতে যে ধারা চলতে শুরু করেছে তা যেন অতীতের সমস্ত অপকর্মকে নস্যাৎ করে দিয়ে জনস্বার্থ বিরোধিতায় নতুন নতুন নজির সৃষ্টি করে চলেছে। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এমনকী সামাজিক বোধের ক্ষেত্রেও এক চরম অপরাধমূলক কুকর্ম অবাধে চলেছে। বিজেপি বা এন ডি এ সরকার বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে কিছুকাল ক্ষমতায় ছিল। অটলবিহারী বাজপেয়ী ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তখনকার ইতিহাসও জানা।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সেকালেও কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায় বারেবারেই নাক গলিয়েছে। মনমোহন সিং-নরসিমহা রাও-চিদম্বরম বা (এন এন সি)'র উদ্যোগে যে নয়াউদারবাদী প্রকল্পগুলি এ দেশে অনুসৃত হতে শুরু করেছিল সেগুলির উদগ্র বাস্তবায়ন চলেছিল বাজপেয়ী আমলে। তাহলেও বর্তমানের মতো এমন সর্বব্যাপী সংকট দেশের জনজীবনকে বিধ্বস্ত করেনি। এমন ফ্যাসিবাদী প্রবণতা দেশের শাসককুলকে গ্রাস করে ফেলেনি।

নরেন্দ্র মোদীর সরকার অতীতের সমস্ত রেকর্ডগুলি চূর্ণ করে দেশে এক অশ্রুতপূর্ব নৈরাজ্যের রাজত্ব কায়েম করেছে। অর্থনৈতিক বৈকল্য বা বিকৃতিগুলি পরিকল্পিত ভাবে দেশের জনজীবনকে প্রতিনিয়ত ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। বেকারত্বের বহর বাড়তে বাড়তে এখন এক অনতিক্রম্য পর্যায়ে। যুবজীবন অন্ধকারময়। শিল্পক্ষেত্রে অভাবিতপূর্ব যন্ত্রণাময় পরিস্থিতি। ধর্মীয় বিচারই একমাত্র মাপকাঠি। ঘৃণা ও বিদ্বেষ গ্রাস করেছে গ্রামীণ জনমানসকেও। জাতপাত ভিত্তিক বিচার সর্বপ্রধান। ইতিহাস, দেশের ঐতিহ্য এবং সুস্থ সংস্কৃতিবোধ প্রভৃতি অমিতশাহ'র মতো এক অতি নিম্নরুচির ব্যক্তি অধিকৃত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেশের নানা প্রান্তে লোকসাধারণের জীবনে সহস্র পথে অপরাধমূলক অরাজকতা সৃষ্টি করে চলেছে। যত সীমাবদ্ধতাই থাকুক, দেশের সংবিধান বিপর্যস্ত করে অন্ততপক্ষে গণতান্ত্রিক আবহকে কখনও এমনভাবে চ্যালেঞ্জ জানায়নি। এখন তো যেমন তেমন করে সাংবিধানিক ব্যবস্থাগুলি এবং নানাবিধ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকেও নির্মমভাবে আঘাত করা হচ্ছে। ধ্বংস করে চলেছে ভারত রাষ্ট্রের স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেও।

একথা সত্যি যে, বিগত ২০০৭-০৮ সাল থেকে দুনিয়া জুড়ে যে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী পুঁজিবাদী সংকট জাঁকিয়ে বসেছে তা, ভারতরাষ্ট্রেরই শুধু নয়, বহু দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থ-রাজনৈতিক পরিবেশে অপরিমেয় দুরবস্থার প্রাদুর্ভাব সৃষ্টি করেছে। মোদী-শাহ নেতৃত্বাধীন সরকার বিশ্বপুঁজিবাদের বিকৃতি সাধনার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে। ভারতের বিশাল জনসংখ্যার বাজার দখলে উন্মাদের মতো প্রক্রিয়া চলছে। মোদী বিশ্বগুরু সাজার অলীক শখে দেশের সাধারণ জনজীবনকে বাজি ধরে বসেছেন। এমন অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব একাজ করতেই হবে। দেশ ও দশের স্বার্থে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত মানুষের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতেই হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নয়া নির্দেশ

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়মিত ধ্যানের অভ্যাস করতে হবে। ২৪ নভেম্বরের এক বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে, শ্রীশ্রীরবিশঙ্করের Art of Living Foundation অনুসৃত প্রণালী অনুযায়ীই এই ধ্যানের অভ্যাস করতে হবে। বিস্মিত হওয়ার মতই ঘটনা যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) রবিশঙ্কর প্রতিষ্ঠিত Foundation এর পক্ষে প্রচার শুরু করেছে। অভূতপূর্ব ঘটনা হলেও, মনে হয় এই জমানায় সবই সম্ভব। দুষ্টুলোকে এমন প্রশ্ন করতেই পারে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের এমন বিজ্ঞপ্তি জারি করার কোনও ক্ষমতা আছে কী? উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র শিক্ষাপ্রসারের উদ্দেশ্যে কোন ধরনের কর্মসূচি অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করবে একমাত্র ইউ জি সি। দেশে শিক্ষার প্রসার বা শিক্ষার মান বজায় রক্ষার জন্য ইউ জি সি দায়বদ্ধ। শিক্ষা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ইউ জি সিকে। কোনওভাবেই সরকার ইউ জি সি-র কাজে হস্তক্ষেপ বা নাক গলাতে পারে না, পারা উচিত নয়। কিন্তু ২০১৪-র পর, বাস্তব পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। পরিস্থিতি এমনই যে বর্তমানে ইউ জি সি কোনো Art of Living Meditation এর প্রচারক হিসাবেই নয়, নানা উপায়ে সরকারে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বা আর এস এস-এর প্রচার কার্যে নানা স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা ছাত্রসমাজ ইউ জি সি নির্দেশিত ধ্যান সম্পর্কিত নির্দেশ গুলি সত্যিই অনুসরণ করছে কিনা, তার উপর নজরদারির জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির ওয়েবসাইট মারফৎ ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শ প্রচারের কাজে দেশের বিশ্ব বিদ্যালয়গুলিকে মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আশঙ্কাজনক ঘটনা, ইউ জি সি'র মতো স্বশাসিত সংস্থাগুলিও হিন্দুত্ববাদী সরকারের প্রচার যন্ত্র হিসাবে কাজ করতে চলেছে। গণতন্ত্রের কফিনে আর কত পেরেক ঠোকা বাকী, সেটাই এখন দেখতে হবে।

প্রবল অর্থ সংকটে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দেশের বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযথ সরকারি অনুদান বন্ধ হওয়ার জন্য তীব্র আর্থিক সংকটে পড়েছে। এই বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সংঘাতের শিকার হয়েছে কী? সংশ্লিষ্ট মহল থেকে এমন প্রশ্নই উঠে এসেছে। ২০১৭ সাল থেকে রাজ্য সরকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদেয় অনুদান বন্ধ রেখেছে, পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারও গত কয়েক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে ব্যাপক কাটছাঁট করেছে। পরিস্থিতির চাপে বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক দুনিয়ার স্বীকৃত গবেষণার কাজগুলির অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। ফলে শিক্ষাজগতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বছরের পরিশ্রম লব্ধ বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থানটি এখন প্রশ্নের মুখে পড়েছে। গত অক্টোবর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আর্থিক সংকট মোকাবিলার জন্য সাহায্যের আবেদন করেছেন। ভাইস চ্যান্সেলরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের অপ্রতুল অনুদানের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে এই সংকটে পড়েছে। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান কর্মসূচি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের প্রাপ্য ১০০ কোটির মধ্যে মাত্র এখন পর্যন্ত মাত্র ৪১ কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে।

উপরন্তু ভারত সরকার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে মর্যাদার প্রতীক Institution of Eminence-এর বিশেষ তকমা থেকেও বঞ্চিত করেছে। ২০১৭ সালের পর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত অনুদানও বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়নি। একদিকে যেমন কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদেয় অর্থের বিপুর কাট ছাঁট করেছে অপরদিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের (Maintenance) জন্য বাজেট কমানোর ফলে এক অসহনীয় পরিস্থিতির মুখে পড়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। বছরে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ ৬০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ২৫ কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে।

আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের নারী নির্যাতনের নতুন ফরমান

আফগানিস্তানের তালিবান সরকার ২২-এর মার্চে মেয়েদের মাধ্যমিক স্তরে স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিল। এবার বছরের শেষে (২২ ডিসেম্বর) মেয়েদের উপর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও নিষেধের খড়্গ নেমে এল। যে পোষাকে মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছিলেন তা শাস্ত্রবিরোধী বলেই মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়াটাই নিষিদ্ধ করতে সিদ্ধান্ত নিল তালিবান সরকার। সর্বজনবিদিত ঘটনা, তালিবান সরকার ইতিপূর্বেই নারীদের প্রকাশ্যে পুরুষ অভিভাবক বা সঙ্গী ছাড়া চলাফেরা নিষিদ্ধ করেছিল। তাছাড়া মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছিলেন মাস্ক ও হিজাবে মুখ ঢেকেই। সেখানে শাস্ত্র বা শরিয়ত বিরোধী পোষাকের কথা কুযুক্তি মাত্র। আসল পুরুষতান্ত্রিক ও চরম কর্তৃত্ববাদী শাসনে মেয়েদের ঘরবন্দি করে রাখাটাই তালিবান সরকারের মূল উদ্দেশ্য। সরকারে কায়েম হওয়ার পর প্রথমদিকে বিশেষত শহরাঞ্চলে তালিবান সরকার নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য মেয়েদের চলাফেরায় কিছুটা ছাড় দিলেও অচিরেই বোঝা গেল তালিবানিরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে।

প্রশ্ন হল, এই একুশ শতকেও ধর্মীয় কর্তৃত্ববাদের শিকার হয়ে আফগানিস্তানে মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়েই থাকবে কি আবহমান।

আন্তর্জাতিক স্তরে আফগানিস্তান নিয়ে আলোচনা চললেও, বেপরোয়া তালিবান সরকারকে বাগে আনতে হলে কেবলমাত্র উদ্বেগ প্রকাশই যথেষ্ট নয়। বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা বা রাষ্ট্রপুঞ্জকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতেই হবে, তালিবান সরকারকে মেয়েদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বাধ্য করাতে হবে।

রাহুল গান্ধীর 'ভারত জোড়ো' যাত্রা

ভারত নামের এই মহান দেশটা যে ভেতর থেকে খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েচে। তার অন্তত একটা রাজনৈতিক স্বীকৃতি পেল এই 'ভারত জোড়ো' যাত্রার মধ্য দিয়ে, কারণ, কোনো জিনিস খণ্ড বিখণ্ড হলেই তাকে জোড়ার কথা ওঠে। দাবি করা হচ্ছে, ভোটের স্বার্থে চালিত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াও দেড়শো দিনের যাত্রা এক অভিনব রাজনৈতিক কর্মসূচি। তামিলনাড়ু থেকে উত্তরপ্রদেশ, বহু প্রধান বিরোধী দলগুলি এই 'ভারত জোড়ো' যাত্রাকে স্বাগত জানালেও এখনও স্পষ্ট নয়, রাহুল গান্ধীর এই প্রয়াসে তাঁরা পা মেলাবেন কিনা। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত হাঁটার মধ্য দিয়ে ভারতকে জোড়া লাগানোর সমস্যা বা ঐক্যবদ্ধ ভারত গড়ার স্বপ্ন হয়ত বাস্তবায়িত হবে না, কিন্তু দীর্ঘ পদযাত্রার এই প্রয়াসের মধ্য দিয়ে রাহুল গান্ধী হয়ত একটা বক্তব্য জনমানসে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। মৃত্যুপথযাত্রী ভারতীয় গণতন্ত্রকে এই 'ভারত জোড়ো' যাত্রার মধ্য দিয়ে 'উদ্ধারের কোনও দিশা দিতে পারবে বলে আশা সম্ভবত দুরাশাই হবে, তবে এই যাত্রার মধ্য দিয়ে রাহুল গান্ধীর রাজনৈতিক পুঁজি কিছু বাড়তে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে, রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে এই যাত্রা যদি কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকেই হয় তবে দলের অন্যান্য নেতাদেরও এই যাত্রায় রাহুল গান্ধীর পাশে তেমনভাবে দেখা যায় নি কেন? ভারতীয় জনতা পার্টির দোর্দণ্ড প্রতাপের বিরুদ্ধে বিরোধী রাজনীতিকে যথেষ্ট উদ্দীপ্ত করতে হলে এই যাত্রাকে উপলক্ষ করে যে ব্যাপক গণ আন্দোলন গড়ে তোলার বাস্তব প্রেক্ষিত ছিল তা বাস্তবায়িত করা গেল না। ভারতের মাটিতে ফ্যাসিবাদের অভিযান রুখতে ভারত জোড়ো যাত্রা হয়ত সেই সাফল্য পাবে না। কিন্তু, বিকল্প কোনো উপায়ে দলমত নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দলগুলিকে এক ছাতার নিচে আনার জন্য বিকল্প ভাবনা প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যে এখন থেকেই সলতে পাকানোর চেষ্টা প্রয়োজন।

একদিনে তিন ছাত্র আত্মঘাতী

এমন ঘটনা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার চূড়ান্ত অনাচার, ব্যর্থতার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। সম্প্রতি ১৪ ডিসেম্বর, ২০২২ রাজস্থানের কোটায় ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে তিন ছাত্র আত্মঘাতী হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নড়েচড়ে বসেছে। রাজস্থান সরকার এবং কেন্দ্রের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের কাছে তারা রিপোর্ট চেয়েছে।

প্রসঙ্গত ১৪ ডিসেম্বর কোটায় ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় বেসরকারি কোচিং সেন্টারগুলির অভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, শুধু রাজস্থান কেন, বস্তুত গোটা দেশেই শিক্ষা ব্যবস্থার নামে যা চলছে তা নিয়ে মানুষ উদ্বিগ্ন। কোটার মর্মান্তিক ঘটনা প্রতীক মাত্র। উচ্চশিক্ষায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে দেশের নানা প্রান্তে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারগুলিতে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ছাত্ররা ভর্তি হয়। ভর্তির প্রতিযোগিতা থাকে তীব্র। অনেকেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

এমন সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি (কোচিং সেন্টার) ব্যবসায়িক স্বার্থের দিকে নজর রেখে যেন তেন প্রকারেন সাফল্যের হার বজায় রাখতে পরীক্ষা প্রস্তুতিতে যে বিপুল চাপ তৈরি করে তা সহ্য করতে পারে না অনেক ছাত্র। এমন অবাঞ্ছিত ঘটনার বাস্তব পটভূমি এমনভাবেই নির্মিত হয়। আসলে আমাদের এই রুগ্ন সমাজ ব্যবস্থায় জীবনে সাফল্য অর্জন সম্পর্কে এমন এক অসুস্থ, অবাঞ্ছিত ধারণা গড়ে উঠেছে যার পরিণতি কোটার ঘটনা। পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলেই জীবন ব্যর্থ এমন এক ধারণার শিকার হয়ে ছাত্রসমাজের মধ্যে বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা, তীব্র মানসিক অস্থিরতা। বেসরকারি শিক্ষার জগতে এমন অব্যবস্থার সুযোগে বাড়ছে সুযোগ সন্ধানীদের অঢেল অর্থ উপার্জনের সুযোগ, চাহিদার জোগান দিতে যত্রতত্র গজিয়ে উঠছে কোচিং ফ্যাক্টরী। এই 'ফ্যাক্টরী বা তথাকথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রকৃত মেধা বা সৃজনশীলতার পরিবর্তে বেশি গুরুত্ব পায় পরীক্ষায় সাফল্য, তা যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন। যদি আমরা সত্যিই ছাত্রসমাজকে ক্রমশ এমন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি থেকে মুক্ত করতে চাই, শিক্ষা ব্যবস্থার এই অবক্ষয় থেকে মুক্ত করতে এক ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

বিপন্ন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা

সংবিধানের যৌথ তালিকায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করার এক বড় কারণ ছিল যার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব উপলব্ধি হতে পারে। ভারতের মতো এক বিশাল দেশে আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি-সত্তাবোধ বিপন্ন হতে পারে এমন আশঙ্কা থেকেই কিছুটা হলেও বিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। অনেক ভাবনাচিন্তার ফসল ছিল রাজ্যভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন নেই এমন কথা বলা যাবে না, কিন্তু তার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার মূল চরিত্রটিকে নষ্ট করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। নরেন্দ্র মোদীর সরকারের আমলে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিকে ভবিষ্যতের উপযোগী এবং ভারতীয়করণ করার নামে শিক্ষাক্ষেত্রে অকারণ কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ, গৈরিকীকরণ এবং দ্রুত হারে বেসরকারিকরণের অপপ্রয়াস শুরু হতে চলেছে। উপরন্তু, বিদেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারতের মাটিতে অবাধ মুনাফা অর্জনের পথ খুলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছে। এর প্রতিবাদে কেবলমাত্র তামিলনাড়ু বা পশ্চিমবাংলাই নয়, ভারতজুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, কারণ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রটিকে বিনাবাধায় বিনাশ হতে দেওয়া যায় না।

প্রসঙ্গত সম্প্রতি জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউ জি সি কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক, বেসরকারি ও ডিমড্ বিশ্ববিদ্যালয়কে (পশ্চিমবঙ্গ বাদে) নিয়ে পাঁচটি উপাচার্য কমিটি তৈরি করেছে। যাদবপুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। রাজনীতির রং ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই।

বস্তুত, কোনো একটি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যেন গোটা দেশকে আচ্ছন্ন না করে, রাজ্যগুলির দৃষ্টিভঙ্গি উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা দূর করতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল, আজ 'ভারতীয়করণ' বলতে ক্ষমতাসীন বিজেপি যা বোঝে, গোটা দেশ তার সঙ্গে সহমত না হতেই পারে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হলে, বিজেপি'র হিন্দুত্ব প্রকল্প এক ধাক্কায় অনেকটাই এগিয়ে যাবে সেটাই আশঙ্কার বিষয়।

আর এস এস-এর বিপদ নানাভাবে বেড়ে চলেছে

(এক)

কলকাতা মহানগর এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলি, যাদের শহরতলী বলা হয় কোথাওই আর সরকার পরিচালিত গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রায় চালু নেই বললেই চলে। সবটাই বেসরকারি মালিকদের উপর নির্ভরশীল। যে সব বাস বিভিন্ন রুটে যাত্রী বহন করে চলেছে প্রায় সবটাই 'প্রাইভেট'। দূরপাল্লার বাসে কিছুটা সরকারি নিয়ন্ত্রণ আছে। কলকাতা শহরের মধ্যে কিছুসংখ্যক উচ্চভাড়ার এসি বাস বিশেষ বিশেষ রুটে চলে। তারও অনেকটাই প্রাইভেট। এসবের সঙ্গে অতীতে যে ট্রামযাত্রা সম্ভব হত তা, এখন প্রায় উঠেই গেছে। বিভিন্ন রাস্তায় ট্রামলাইনগুলি একান্তভাবেই জোব চার্ণক প্রতিষ্ঠিত শহরের ইতিহাস হয়ে রয়েছে। নিরাপদ এবং পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা যা ছিল তা, নির্বিচারে লুপ্ত। অটো রিক্সার প্রচলন হয়েছে ব্যাপক হারে। বিপুল সংখ্যক চাকুরি ইত্যাদির সুযোগবিহীন মানুষের জীবিকা এখন অটো বা টোটো নির্ভর। মাঝে মধ্যেই যাত্রীদের অসহায় অবস্থা।

এভাবে গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি মালিকদের উপর ছেড়ে দেবার কৃতিত্ব বা অকৃতিত্ব অবশ্য বর্তমান তৃণমূল সরকারেরই নয়। এই সরকারের অপশাসনে রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ, হিমালয়প্রমাণ দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার, গণতান্ত্রিক অধিকার পর্যুদস্ত এবং লুম্পেনদের অত্যাচারে গ্রামগ্রামান্তে পর্যন্ত মানুষ তটস্থ হলেও গণপরিবহন ব্যবস্থার নির্বিচার বেসরকারিকরণ শুরু হয়েছিল অতীতের বাম আমলেই। যেভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে পরিবহন ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা সম্ভব ছিল তা, সদিচ্ছা থাকলেও বাস্তবে সম্ভব হয়নি। আমলাতান্ত্রিকতাই বড় বাধা হয়েছিল এক সময়। আর বর্তমান তৃণমূলী দুঃশাসনে এ প্রসঙ্গে সার্বিক সদিচ্ছার অভাব। ফলত এক অরাজক অবস্থা চলছে রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনে।

অতীতে বাস ট্রামের ভাড়া বা মাশুল বৃদ্ধি নিয়ে নানাস্তরে নিবিড় আলোচনা, বিতর্ক পর্যালোচনার পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। বিগতদিনে এ প্রসঙ্গে বামদলগুলির মধ্যে তীব্র মতভেদও প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকারের একটা ভূমিকা ছিলই। সরকারের অনুমোদন ছাড়া ভাড়া বৃদ্ধি অকল্পনীয় ছিল। বিগত এগারো বছরে রাজ্য সরকার এ প্রসঙ্গেও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে চলেছে। বাসের ভাড়া স্থির করছে মালিকদের সিন্ডিকেটগুলিই। সরকারের কোনও ভূমিকাই নেই। ইদানীংকালে, কেন্দ্রের মোদী সরকারের চরম জনস্বার্থবিরোধী ভূমিকায় পেট্রল, ডিজেলের দাম বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। লাগামবিহীন। বাস চালাতে আনুষঙ্গিক যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের দামও বহু পরিমাণে বেড়েছে। গণপরিবহন ব্যবস্থা সচল রাখতে যুক্তিসম্মত বাসভাড়া বৃদ্ধি হয়তো এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু বিগত কয়েক বছর যাবৎ লক্ষ করা যাচ্ছে যে, সরকার এসব নিয়ে এক দারুণ চালাকির আশ্রয় নিয়ে নিজেদের ভাবমূর্তি রক্ষাতেই বিশেষ তৎপর।

বাস মালিকদের সংগঠনগুলির সঙ্গে নিবিড় সদর্থক আলোচনার পরিবর্তে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা নেত্রীদের হুমকি এবং চমক সৃষ্টির অপপ্রয়াসই বেশি করে দেখা গেল। কয়েক দফা আলোচনা যে হয়নি, এমন নয়। কিন্তু সেগুলির পরিণতি লাভের আগেই বাস মালিকরা বহুগুণ বর্ধিত ভাড়া আদায় শুরু করল। মমতা ব্যানার্জী সরকার নিশ্চুপ। যাত্রী সাধারণের প্রাথমিক প্রতিবাদ, চেঁচামেচি এসবের ঘটনা ঘটলেও তেমন কোন সংগঠিত প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি। কালক্রমে কিছুটা সংশোধিত আকারে বাসভাড়া বেড়ে যাওয়াই মানুষ বাধ্য হয়ে মেনে নিল। রাজ্য সরকার দায়িত্বশীল কোনও আচরণের ধার কাছ দিয়েও যায়নি। জনমনোরঞ্জনের যে ভ্রান্ত পথে মমতা ব্যানার্জী সরকার চলে, সেই পথেই চলল। বাস ভাড়া বৃদ্ধি তো আমরা করিনি, এমন দাবি তৃণমূলের নেতা নেত্রীরা প্রায় প্রকাশ্যেই করে গেল। সত্যিই তো, সরকার তো ঘোষণা করে বা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বাসভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা আদৌ জানায় নি। আদপে সরকার কোনও দায়িত্বই নেয়নি। ভোগান্তি সাধারণ যাত্রীদের।

প্রাইভেট বাসগুলির দৈনন্দিন চলাফেরায় যেমন খুশি একটা ভাব বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছে। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক কোনও উপস্থিতিই আর লক্ষ করা যাচ্ছে না। অতীতে বাসের ভাড়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কিছু শর্তাবলী আরোপিত হত। বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাজ্য সরকারের পরিবহন মন্ত্রক যেহেতু চালাকির পথে নিজেদের জন মনোরঞ্জক ভূমিকাতেই বেশি উৎসাহী। সুতরাং যাত্রী সুবিধা কিছুটা নিশ্চিত করার বিষয়ে সরকারের কোনো ভূমিকাই নেই। সাধারণ মানুষের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতাই নেই। বাসভাড়া নিয়ন্ত্রণে যেহেতু সরকারের কোনই ভূমিকা নেই সুতরাং বেসরকারি বাসগুলির দৈনন্দিন পরিচালনায় কোনও ভূমিকাও নেই প্রশাসনের। যেমন খুশি তেমনই হচ্ছে। মাঝখানে পিষ্ট হচ্ছে সাধারণ যাত্রীরা। বাস মালিকদের সঙ্গে কোনো গোপন চুক্তি হয়ে গেছে বলে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। গোপনীয়তার মধ্যে তৃণমূল নেতৃত্ব কত অর্থ আদায় করেছে, তা নিশ্চিত করে বুঝে ওঠা অসম্ভব। শহরতলীর বাস পরিষেবার পরিস্থিতি আরও খারাপ।

(দুই)

যাত্রীবাহী বাসপরিষেবা ক্ষেত্রে এই নৈরাজ্য চলছেই। তার মধ্যেই কৌতুককর হলেও লক্ষণীয় যে, বেসরকারী বাসগুলির গায়ে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দু ধর্মের দেবদেবীদের নামে জয়ধ্বনি। কোথাও লেখা হচ্ছে 'হরি ওঁ তৎ সৎ, কোথাও বা নমঃ শিবায়' ইত্যাদি। এমন বিশাল ধর্মীয় স্লোগান অতীতে দেখা যেত না। এসবের মধ্য দিয়েও পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আর এস এস-এর ভাবধারা পুষ্ট হচ্ছে। এই ফ্যাসিবাদী সংগঠনটি মুখ্যত সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় আনুগত্যের উস্কানি দিয়েই নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। এটাই ওদের সহজপথ।

প্রাইভেট বাস মালিকদের সবাই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন, এমন ভাবনা সঠিক নয়। কিন্তু অচেতনভাবে হলেও বাসের গায়ে এমন সব ধর্মীয় প্রচার প্রকারান্তরে স্বয়ংসেবক সংঘের উদ্দেশ্য সফল করতে সহায়ক হয়। ধর্মীয় আবেগ মানুষকে সহজেই বিবশ করে ফেলতে পারে।

বিগত বছর দশেক যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে যে আর এস এস-এর উল্কাসম উত্থান ঘটেছে তা, সকলেই হয়তো জানেন। এক সময় এই বিষাক্ত ফ্যাসিবাদী সংগঠনের প্রচার এই রাজ্যের জনমানসে বহুভাবে চেষ্টা করেও তেমন কোনো স্থান পাননি। তৃণমূল কংগ্রেস শাসনকালে আর সে অবস্থা নেই। এখন তো তাদের সর সংঘচালক মোহন ভাগবৎ রাজ্যে এলে স্বয়ং তৃণমূল সুপ্রিমো তাঁর উদ্দেশ্যে দামি উপহার পাঠান। তাঁর কাছে নতমস্তকে হয়তো উপদেশও গ্রহণ করেন। প্রকাশ্যে আর এস এস-এর প্রশংসা করেন। সম্ভবত, তৃণমূল কংগ্রেস দলের যে পর্বৎপ্রমাণ দুর্নীতি, যার বিরুদ্ধে সিবিআই, ইডি'র চমকপ্রদ তদন্ত চলেছে তা বন্ধ করার জন্য সুপ্রিমো চেষ্টা করেন। একে চালু ভাষায় বলা হয় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে 'সেটিং' করার অপচেষ্টা করেন।

রাজ্য সরকারের এমন ভূমিকায় সংঘের প্রচারকরা বিপুল উৎসাহে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অথবা শহর অঞ্চলগুলিতে বুক ফুলিয়ে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষের অবিরাম প্রচার চালান। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের দেশের সমস্ত যন্ত্রণার মুখ্য কারণ হিসেবে সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে চলে এদের নিবিড় প্রচার। হিন্দুত্ববাদী উগ্র সাম্প্রদায়িকতা দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বিশেষ স্থান করে নিতে পারে। ফ্যাসিবাদী প্রবণতাগুলি বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করে মানুষকে বিপথে চালিত করে। ধর্ম সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করে তার মধ্যে মানুষের মননকে নিমজ্জিত করে ফেলে। নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, অধুনা গণপরিবহনের বিজ্ঞাপনগুলিও কোনভাবে এদের এমন অপচেষ্টার সহায়ক হচ্ছে কিনা।

হিন্দু ধর্মের দেবদেবীদের নিয়ে এমন প্রচার সংখ্যালঘিষ্ঠ ধর্মের কোনো কোনো অংশকেও প্ররোচিত করছে। কিছু কিছু বাসের গায়ে ইসলাম সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনও দেখা যাচ্ছে। আর এস এস এই অবস্থাটাই প্রার্থনা করে। দুই ধর্মের মানুষদের মেরুকরণ করা গেলেই শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সংহতি বিপথগামী হতে পারে। এ এক জটিল ও কঠিন ষড়যন্ত্র। এই রাজ্যের বামপন্থী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিকাশ ও অগ্রগমন স্তব্ধ করতে এর কোনো জুড়ি নেই। তৃণমূল কংগ্রেস এমন এক বিভ্রান্তিময় অবস্থার বিকাশে নিবিড় পরিকল্পনা মতো এগিয়ে চলেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ সচেতন সাবধানতা নিয়েই চলতে হবে।

অধুনা সংগঠিত হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, বিজেপি'র পরাভব ঘটেছে। রাজ্য সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের আর কোনো ভূমিকা নেই। জাতীয় কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। হিন্দু ধর্মাবলম্বিত মানুষের সংখ্যাধিক্য এই রাজ্যে। আর এস এস এবং বিজেপি'র সাম্প্রদায়িক প্রচার তুঙ্গে ছিল। তারা আশা করেছিল যে হিন্দুত্ববাদী প্রচারের বাড়াবাড়ি রাজ্যের মানুষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে। কিন্তু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তব অনুপস্থিতি মানুষের মনে তেমন বিশেষ কোনো ছাপই ফেলতে পারেনি। আসলে প্রতিপক্ষ হিসেবে যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের দেখানো না যায় তা হলে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক প্রচার তেমন গুরুত্ব পায় না।

বিজেপি যে উচ্চকিত কায়দায় হিন্দুত্ববাদী বিদ্বেষ ও ঘৃণার প্রচার চালাচ্ছে তা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস্তব অনুপস্থিতিতে এবং তাদেরও এক ধরনের পাল্টা প্রচারের কোনো অস্তিত্ব না থাকলে প্রার্থিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় যেভাবে সংখ্যালঘু মানুষদের লোকদেখানো সুযোগ সুবিধার প্রচার হয় তা আর এস এস-এর পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষদের মনে মুসলিম বিদ্বেষের বীজ বপন করার অপকর্ম অনেক সহজেই করা সম্ভব হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে তৃণমূল কংগ্রেসের মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কে যে ভূমিকা তা পরোক্ষে উগ্রহিন্দুত্ববাদীদের প্রভূত সুযোগ করে দিচ্ছে। দু'পক্ষের মধ্যে লড়াই বাঁধিয়ে এইভাবে অপশক্তিগুলি তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করে

বাঁকুড়ায় জয়েন্ট কাউন্সিল অফ হেলথ-এর ১৪তম রাজ্য সম্মেলন

গত ১৭-১৮ ডিসেম্বর ২০২২ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরে কর্মরত স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারিদের শ্রমিক-কর্মচারি সংগঠনের মঞ্চ জয়েন্ট কাউন্সিল অফ হেলথ-এর ১৪তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া শহরে কম. অমল দাশগুপ্ত নগরের ধর্মশালা রাধাভবনে কম. ক্ষিতি গোস্বামী, কম. অমল ঘোষ, কম. চণ্ডীচরণ সাঁতরা নামাঙ্কিত সুসজ্জিত মঞ্চে শতাধিক স্বাস্থ্য কর্মচারির উপস্থিতিতে সাফল্যের সাথে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের প্রায় সব কয়টি জেলার প্রতিনিধি এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন।

রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের ৩৫ শতাংশ বকেয়া মহার্ঘ ভাতা, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সপ্তম বেতন কমিশন চালু করা, সমস্ত অস্থায়ী স্বাস্থ্য কর্মীদের স্থায়ীকরণ, সমস্ত কর্মচারিদের জন্য পেনশন/ফ্যামিলি পেনশন চালু করা। গ্র্যাচুইটি ও লিভ স্যালারি নিয়মিত প্রদান করার দাবি প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের অনমনীয় মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেন প্রতিনিধিবৃন্দ। ANM/GNMদের নিয়োগের নীতি বদল করে ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারীদের পরিবর্তে বি এস সি মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট নিয়োগের দাবি জোরের সঙ্গে উত্থাপন করা হয়। তাছাড়া Qualification upgrade করে উন্নততর বেতনকাঠামো সহ HA (M) কর্মী নিয়োগের দাবিতেও সরব হন অনেকে। রাজ্য সম্মেলনে কম. রণজিত রায় সভাপতি এবং কম. তিমিরবরণ রায়কে সম্পাদক সহ ৩৭ জনের শক্তিশালী রাজ্য কমিটি এবং ১৭ জনের সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত করা হয়।

প্রয়াত কম. অসীম ব্যানার্জী স্মরণে

মানুষের মাঝে মানুষের সাথে অমর থেকো অসীমদা

গৌতম গুপ্ত

দক্ষিণ দিনাজপুর পশ্চিমবাংলার আর এস পি তথা বামপন্থী আন্দোলনে বহু নেতা কর্মীর জন্ম দিয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত। মার্কসবাদী লেনিনবাদী আদর্শে সেই সব নেতা কর্মী জেলার আন্দোলনের প্রবাহ থেকে যুক্ত হয়েছেন পশ্চিমবাংলার বৃহত্তর বামপন্থী রাজনৈতিক সংগ্রামে।

এদের মধ্যে, শাসকদলের সন্ত্রাস কবলিত ১৯৭১ সালে পরপর দুজন মানুষ মালদায় দল গড়ে তোলার কাজে যুক্ত একজন বর্তমানে আর এস পি'র রাজ্য সম্পাদক কম. তপন হোড়, অন্যজন সদ্যপ্রয়াত নেতা কম. অসীম ব্যানার্জী। যাঁদের হাত ধরে মালদা জেলা সত্তরের দশকে কয়েকজন তরুণ, তৎকালীন নেতা কম. প্রমথনাথ সাহা, কম. কৃতিশ চন্দ্র ঘোষ, কম. ধীরেন সাহা প্রমুখের সান্নিধ্য আর এস পি দলকে নতুন করে গড়ে তোলেন কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে।

১৯৬৬ সালে সদ্য যুবক অসীম ব্যানার্জী খাদ্য আন্দোলনে দক্ষিণ দিনাজপুরের তৎকালীন মূল সংগঠক ডাঃ ধীরেন ব্যানার্জীর সাথে রায়গঞ্জ জেলে কারারুদ্ধ হন। ডা. ধীরেন ব্যানার্জীর ভ্রাতুষ্পুত্র, অজিত (কালী) ব্যানার্জীর পুত্র অসীম ব্যানার্জী দক্ষিণ দিনাজপুরে ১৯৬৯ সালে ছাত্র সংগঠন পি এস ইউ'র জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন। সেখানে দায়িত্বের সাথে সংগঠন গড়ে তোলেন। তারপর পারিবারিক ও সাংগঠনিক কারণে মালদায় চলে আসেন। প্রচারবিমুখ, আড্ডাবাজ, যে কোনও মানুষের সাথে সহজে মিশে যাওয়া, শহর ও গ্রামাঞ্চলে মাইলের পর মাইল ঘুরে নীরবে আর এস পি দলের সংগঠন বিস্তৃত করার স্বপ্ন নিয়ে নিজের হাতে আমাদের নিয়ে একটি পরিশ্রমী, উৎসাহী, সমাজসচেতন জেলা নেতৃত্ব গড়ে তোলেন। তৎকালীন কংগ্রেসী আবহে বামপন্থী আন্দোলনে জেলার প্রায় সমস্ত ব্লকে অসংখ্য কর্মী নেতা তৈরী করেন কম. অসীম ব্যানার্জী। তিনি সেসময় এক রাজ্য সরকারী কর্মচারীর অতি দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকাও সমান দক্ষতায় পালন করেছেন।

সাংগঠনিক কাঠামোর রাজনৈতিক ভিত্তির মধ্য দিয়ে তৈরী হয়েছিল আর এস পি'র মালদা জেলা কমিটি। তরুণ জেলা সম্পাদক সহ জেলার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ—যাঁরা প্রায় সকলেই মহামতি লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লব থেকে দেশ বিদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রায় সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষাই পেয়েছেন অসীম ব্যানার্জীর কাছ থেকে, তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে। জানলে একটু অবাক হতে হয়, দীর্ঘদিন আর এস পি মালদা জেলা পার্টির অধিকাংশ খরচ তিনি অন্যান্যদের হাতে তুলে দিতেন তাঁর নিজের উপার্জন থেকে। সকলকেই নানাভাবে একে একে প্রচারের জায়গায় পৌঁছে দিয়ে নিজে অবলীলায় একান্ত গোপনেই একজন সাধারণ কর্মীর মতো থাকতেন। এমনকি, তাঁদের নির্দেশে পরবর্তীকালে নির্বিবাদে চলতেন। এমনকি, বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছর ক্ষমতায় থাকার কালেও একইরকম থেকে গিয়েছিলেন জীবনভর।

অসাধারণ মেধাবী, বামপন্থী রাজনীতির আদর্শ এই নেতা কিংবা কর্মী যাই বলা হোক—ক্ষীয়মান সত্তর-এর দশকের পূর্বেকার মালদার আর এস পি দলকে বামপন্থী আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে তারই সাথীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, অথচ প্রচারের আলোর তাঁর বিন্দুমাত্র আসক্তি ছিল না। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালে লালবাতির আলোর গাড়িতে ঘুরে বেড়াতেও ছিল না তাঁর কোনও আগ্রহ। বাসে, মিনিবাসে, ট্রাকে, সাইকেলে ঘুরে ঘুরে সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে তাঁর মেধা, সংগঠন চেতনা, আন্দোলনের শক্তিকে প্রবাহিত করার ধারাবাহিকতা তাকে বামপন্থীসহ অন্যান্য দলের মানুষের কাছেও ''কাছের মানুষ'' করে তুলেছিল। তিনি মার্কসবাদ ছাড়াও ইতিহাস, বিজ্ঞান, অংক, ভূগোল সবেতেই ছিলেন অনন্য।

এই মার্কসবাদ লেনিনবাদ প্রত্যয়ী মানুষটি এসেছিলেন অনুশীলন সমিতির প্রবাদ পুরুষ পরেশ গুহ (যাকে তিনি ছোট জেঠু বলতেন), সহ ত্রিদিব চৌধুরী, মাখন পাল, ননী ভট্টাচার্য প্রমুখ সহ ইস্পাতকঠিন আর এস পি দল তথা বাম নেতৃত্বের সংস্পর্শে থেকে। তাঁর বাল্যকাল থেকেই নানান বাম আন্দোলনের অনুভূতিকে নিয়ে গড়ে ওঠা অন্যরকম জীবনের মধ্যে দিয়ে ধাপে ধাপে—তিনি চিরকাল বহন করেছেন নিজের জীবদ্দশায়।

অসীমদা তুমি অমর থেকো চিরকাল মানুষের মাঝে। তোমার মতো মানুষের মৃত্যু হয় না। আমাদের মতো আর এস পি'র সাধারণ কমরেডদের মনে তুমি বহু বহুকাল জীবিত থাকবে। তোমার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই আমরা বামপন্থী আন্দোলনে আজীবন যুক্ত থাকব। তোমার স্বপ্ন ছিল শ্রমজীবী মানুষের বিজয়। সেই স্বপ্ন তোমার অকাল প্রয়াণের পর আমরা দৃঢ়ভাবে বহন করে যাবো।

তরুণতীর্থের শিশু কিশোর উৎসব ২০২২

প্রাণঢালা আনন্দ উচ্ছ্বাস এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোরদের কল্যাণকামী সংস্থা তরুণতীর্থের বৃহত্তর কলকাতা জেলা শাখার উদ্যোগে ২৬ থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি শিশু কিশোর উৎসব অনুষ্ঠিত হলো উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার গাজনা কিশলয় তরুণতীর্থ প্রাঙ্গণে। এই উপলক্ষে শিশু কিশোরদের শারীরিক মানসিক ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে কিশলয় তরুণতীর্থের ভাইবোনেরা ছাড়াও অংশগ্রহণ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্তোষপুরের কল্যাণ তরুণতীর্থ, নলগোরা রামকৃষ্ণ তরুণতীর্থ, উত্তর ২৪ পরগনার গঙ্গানগর তরুণতীর্থ, হাবরা মুকুল ছন্দ তরুণতীর্থ, মুর্শিদাবাদের নরেন্দ্রনাথ তরুণতীর্থ। এ ছাড়াও সোদপুর, দুর্গানগর, নপাড়া, কাঁকুড়গাছি প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাক্তন সংগঠক সাথীরা সহ ২০০ জন কিশোর কিশোরী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করে।

২৬ ডিসেম্বর বিকেলে এই শিশু-কিশোররা উৎসব প্রাঙ্গনে পৌঁছায়। ঐদিন সন্ধ্যায় প্রস্তুতি সভার মাধ্যমে পরিচিতি পর্ব, শিবিরের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, সংগীত পরিবেশনার সাথে তরুণতীর্থ কি ও কেন, এই বিষয়ে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা সুবোধ ভৌমিক, রাজ্য সম্পাদক গগন নস্কর, জেলা সভাপতি মৃণাল গুপ্ত, জেলা সম্পাদক মদন নন্দী ও ভাস্কর বসু।

২৭ ডিসেম্বর পরিবেশ সচেতনতামূলক একটি বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরী অনুষ্ঠিত হয়। দূষণমুক্ত পানীয় জল, জল সংরক্ষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণ বন্ধ প্রভৃতি দাবি সহ শিশু-কিশোরদের সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য আদর্শ পরিবেশ গঠন ও সুযোগ দানের দাবি সম্বলিত প্লাকার্ড হাতে তরুণতীর্থের স্লোগান, ব্যান্ড-বিউগল, বাঁশি, রণ-পা ও সুসজ্জিত ট্যাবলো সহ এই মিছিল এলাকার গ্রামের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। বিশিষ্ট অতিথিগণ, রাজ্য নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব, শিবিরে অংশগ্রহণকারী সকলে, অভিভাবক এবং এলাকার অনেক সহৃদয় ব্যক্তি এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে ওই দিনেই এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা সুবোধ ভৌমিক, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ও আকাশবাণীর প্রাক্তন জেলা সাংবাদিক নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন কাঠি সমবায় সমিতির কর্ণধার কালিপদ সরকার, প্রাক্তন শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক, নলগোরা রামকৃষ্ণ তরুণতীর্থের সভাপতি ও নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক ও জেলা সহ সভাপতি তাপস কুমার মণ্ডল, গাইঘাটা সার্কেল-এর শিক্ষাবন্ধু মিলন সাহা, তরুণতীর্থের প্রাক্তন রাজ্য সংগঠক শিখা দত্ত প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সুবোধ ভৌমিক। ডক্টর নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সুবোধ ভৌমিক আসরের পতাকা উত্তোলন এবং অতিথিগণের সমবেত প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এর মধ্য দিয়ে এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই দিন এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন দোলা বসু ফাউন্ডেশন-এর কর্ণধার তিলক বসু। সাথে উপস্থিত ছিলেন সোসাইটি ফর টেকনোলজি উইথ এ হিউম্যান ফেস-এর সভাপতি প্রসূন সেনগুপ্ত। এই প্রদর্শনীতে শিশুদের উপযোগী নানা চিত্তাকর্ষক বই; স্বনির্ভর দলের উৎপাদিত সামগ্রী এবং পানীয় জলে আর্সেনিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়।

২৮ ডিসেম্বর একটি স্বরচিত কবিতা পাঠের আসরের আয়োজন করা হয়। এই কবিতা পাঠের আসরে এলাকার তরুণ, যুবক, নতুন কবিরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অনেক বিশিষ্ট কবি যেমন সোদপুর চন্দ্রচূড় হাইস্কুলের শিক্ষক-কবি-সাহিত্যিক ও গীতিকার শৈলেন্দ্র হালদার, কবি সুভাষ রায়, অল ইন্ডিয়া রেডিওর গীতিকার ও সুরকার কবি তাপস অধিকারী, কবি ও শিক্ষক শেলী অধিকারী, কবি ও প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অরুণাভ লাহিড়ী, চাঁদপাড়া গার্লস হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ও কবি পম্পা বিশ্বাস। এরা প্রত্যেকেই স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন প্রতিমা বোস, মিলন সাহা, অতনু ঘোষ, দেবস্মিত বসু, দেবত্র বসু, তাপস কুমার মণ্ডল প্রমুখ।

ভাবগম্ভীর পরিবেশে এই আসরটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। উপস্থিত অতিথিবর্গ এই আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কবি শৈলেন্দ্র হালদার-এর লেখা কবিতায় দেবত্র বসু সুর দিয়ে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে পরিবেশন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তরুণতীর্থের প্রাক্তন সাথী প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক পার্থসারথি দাশগুপ্ত। কিশোর কুমার বেপারী ছড়ার মাধ্যমে অতিথিদের স্বাগত জানান এবং শেষে অতিথিদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন মৃণাল গুপ্ত। ২৯ ডিসেম্বর বিকালে একটি বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। ''শিশুর বিকাশে শরীর ও মনের সম্পর্ক'' এই বিষয়ক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন ডক্টর অরূপ পাল, ডক্টর অনির্বাণ বিশ্বাস, ডঃ কোয়েলা ঘোষ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ডঃ রীতা কর, তরুণতীর্থের বর্ষীয়ান সাথী ও উপদেষ্টা অশোক ঘোষ, বিশিষ্ট আবৃত্তিকার নাট্যকার নাট্যাভিনেতা ও কবি প্রলয় চৌধুরী, শৈলেন্দ্রনাথ হালদার, তপন দাস। শিবিরে অংশগ্রহণকারী দ্বিতীয় শ্রেণিতে পাঠরত অর্থী দত্ত ও তৃষা চন্দ্র নামের দুজন বোন এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তরুণতীর্থের প্রাক্তন সাথী স্বপন ঘোষ। আসর সংগঠক এবং অভিভাবক সহ ৮০ জন এই সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন। নির্দিষ্ট বিষয়টির উপরে বক্তারা বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন। অতিথিদের ধন্যবাদ জানান জেলা সভাপতি মৃণাল গুপ্ত।

উৎসবের দিনগুলিতে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যে পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই পরিবেশনার মধ্যে ছিল সঙ্গীত, আবৃত্তি, একাঙ্ক নাটক, মাইম, পূর্ণাঙ্গ নাটক, লোকনৃত্য, ছড়া, নৃত্য, ড্রিল প্রভৃতি। শিক্ষার্থীরা শিবিরের যে সমস্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে তার অভিনব প্রদর্শনী এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও কিশলয় তরুণতীর্থ, মুকুল ছন্দ তরুণতীর্থ ও কল্যাণ তরুণতীর্থের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ভাস্কর বসু।

শিক্ষা শিবিরে উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন সলিল ঘোষ, বিশ্বজিৎ তা, পম্পা রায় বিশ্বাস, বিধান দাস, সন্তু প্রামাণিক, শিবু দে, রমা হালদার, সুখেন্দু নস্কর। ক্যাম্প পরিচালনায় ছিলেন গগন নস্কর এবং মাঠ পরিচালনায় সলিল ঘোষ, সহকারী মাঠ পরিচালক বিশ্বজিৎ তা।

এই উৎসবের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা সুজিত দে-এর নেতৃত্বে সমগ্র আয়োজনটি সুন্দর ও সার্থক রূপে অনুষ্ঠিত হয়। তাপস রায়ের মূল দায়িত্বে আহারের ব্যবস্থা সময় মাফিক ও সুষ্ঠু রূপে সম্পন্ন হয়। আসর পতাকা, রঙিন পতাকা, বেলুন ও আলোর মালা দিয়ে উৎসব প্রাঙ্গন সাজানো হয়। শিবিরের অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে শংসাপত্র দেওয়া হয়। ৩০ ডিসেম্বর রাতের অনুষ্ঠানের পর ক্যাম্প ফায়ারের মাধ্যমে শিবিরের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি করা হয়। খড়ের আগুন আর আতসবাজির সাথে অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ঝরে পড়ে অংশগ্রহণকারীদের অনাবিল উচ্ছ্বাস। কিন্তু জল ঢেলে এই আগুন নেভানোর সাথে সাথেই অংশগ্রহণকারীদের অনেকেরই চোখের জল ঝরতে শুরু করে। ক্যাম্প থেকে বিদায়ের বেদনায় তাদের সে কি কান্না। ধরে ধরে বুঝিয়ে, আদর করে, শান্ত করতেও হিমশিম খেয়ে যান অনেক প্রবীণ সংগঠকেরা। এই শিবিরের শৃঙ্খলা, ড্রিল-নাচ-গান ইত্যাদি শিক্ষা, খাওয়া-দাওয়া, থাকা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর কাছে জীবনের একটি অতীব সুন্দর অভিজ্ঞতা, প্রেরণা ও উচ্ছ্বাস আনন্দ বয়ে এনেছে। এই অভিজ্ঞতা তাদের সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে এবং চলার পথে উৎসাহ যোগাবে।

কমরেড মিহির সেনগুপ্ত প্রয়াত

মার্কসবাদ লেনিনবাদে ঋদ্ধ বিপ্লবী সমাজবাদে প্রত্যয়ী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী কম. মিহির সেনগুপ্ত ৪ জানুয়ারি ২০২৩ প্রয়াত হয়েছেন।

১৯৩২-এর ২ মার্চ পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার মাহিলারা গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর শৈশব ও ছাত্রজীবনের অনেকটা সময় কাটে উত্তরবঙ্গের রংপুরে। তাঁর বাবা হিমাংশু সেনগুপ্ত রংপুরের কারমাইকেল কলেজের লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। মিহির সেনগুপ্ত-র পোষাকী নাম ছিল 'হিমাদ্রি', বাবার নামের সূত্র ধরেই। তিনি দীর্ঘসময় জলপাইগুড়ির উকিল পাড়ায় মামার বাড়িতে কাটিয়েছেন। মামা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন, সে সময়ের নামকরা বড়ি বিল্ডার, তাঁর একটি ব্যায়ামাগার ছিল। মিহির সেনগুপ্তরা দুই ভাই, তিন বোন; আজ সবাই প্রয়াত। ভাইবোনেরা সকলেই শিক্ষকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। মিহির সেনগুপ্তের একমাত্র কন্যা অধ্যাপনায় যুক্ত এবং স্ত্রী-ও কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। তাঁর ভাগ্নে মিলিটারির লেফটেন্যান্ট কর্নেল। মিহির সেনগুপ্তের বাবা দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকায় তাঁর সেবাযত্ন এবং সাংসারিক অভাবের কারণে অনেক বেশি বয়সে তিনি কলেজে ভর্তি হন। অন্যান্য কলেজের মতো তখন মতিঝিল কলেজও ছিল ছাত্র রাজনীতির পীঠস্থান। কলেজে পড়াকালীন তিনি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন পি এস ইউ'র সাথে যুক্ত হন এবং ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করে একবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি আর এস পি'র সাথে যুক্ত হন এবং আজীবন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শে অটুট ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্তেও দমদম (দঃ) আঞ্চলিক সম্পাদকমণ্ডলীর এবং জেলার সাম্মানিক সদস্য ছিলেন। ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য দমদমের বিভিন্ন কলোনি স্থাপনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। মশার উপদ্রব রুখতে এবং পাড়ার পুকুরের জল পরিষ্কার রাখতে কচুরীপানা তোলা, গৃহহীন গরিব মানুষের গৃহের ব্যবস্থা, অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা প্রভৃতি বিবিধ সামাজিক কাজের সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকেও তিনি ১৯৬৭ সাল থেকে পরপর তিনবার দঃ দমদম পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হন। কাজের প্রতি নিষ্ঠা ও সততা তাঁকে দমদম তথা বৃহত্তর সমাজে এক বিশেষ জায়গা করে দেয়। জেশপ কোম্পানির শ্রমিকদের নিয়ে একটা সেল গঠন, শ্রমিক সংগঠন ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত দমদম ক্যান্টনমেন্ট বাজার সমিতি গঠন, বস্তি ও ধাঙ্গর ইউনিয়ন গঠন করতে তিনি ছিলেন অগ্রণী। নানাবিধ কাজের পাশাপাশি তিনি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ছাত্র তৈরি করার ব্রতে বিদ্যালয় গঠনে মনোনিবেশ করেন। তথাকথিত সরকারি নিয়মবিধির মধ্যে শিক্ষাকে আবদ্ধ না রেখে তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষায় মুক্ত চিন্তা ও ছাত্র-ছাত্রীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ। মিহির সেনগুপ্ত ছিলেন সমাজ বদলাবার স্বপ্নের মুসাফির, রবীন্দ্র শিক্ষাভাবনার নির্যাসে শিক্ষাবিস্তারের সংকল্পে ১৯৬৫ সালে তিনি দমদমে তৈরি করলেন 'কিশোরভারতী' বিদ্যালয়। মাত্র ন'জন পড়ুয়া নিয়ে শুরু হওয়া প্রতিষ্ঠান আজ এক মহীরুহ। ওর বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। নিয়মমাফিক বিষয় পাঠক্রমিক পড়াশুনার সাথে সাথে তিনি বিদ্যালয়ে অঙ্কন, সংগীত, বিতর্ক, কুইজ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, পর্বতারোহণ, ব্রতচারী, খেলাধূলা প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক শিক্ষা দেওয়ার যে প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন আজও তা অমলিন। বিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানটি ব্যতিক্রমী।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী এবং অভিভাবকবৃন্দ সবাই কিশোরভারতী পরিবারের এক একজন সদস্য। এই পরিবারের সকলের মধ্যে দাদা-ভাইবোনের সম্পর্ক। এই বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালীন কোনো নজরদারির ব্যবস্থা ছিল না, আসলে পরিবেশটাই এমন ছিল যে, ছাত্রদের মধ্যে কেউ অন্যের সাহায্য নিয়ে পরীক্ষা দেবে তা তাদের ভাবনার অতীত। বৃক্ষরোপণ ও স্বেচ্ছায় রক্তদান এই বিদ্যালয়ের অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। দমদমের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সবুজায়নে কিশোরভারতী অগ্রণী এবং মিহির সেনগুপ্তের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে এই বিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম রক্তদান শুরু হয়। মিহির সেনগুপ্ত নিজে বহু বছর রক্তদান করেছেন, আজীবন কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান সমিতির সদস্য ছিলেন। সামাজিক, মানসিক ও চরিত্র গঠনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। মিহির সেনগুপ্তর নেতৃত্বে শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবকরা ছুটে যেতেন বন্যা বিধ্বস্ত আর্ত মানুষের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দিতে। দু'বছর আগেও প্রচণ্ড শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে তিনি করোনা অতিমারীকালে নিরন্ন মানুষদের পঞ্চাশটি পরিবারকে একমাসব্যাপী খাদ্যসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছেন। ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে তিনি বেশ কয়েক বছর নাগেরবাজারে শতাব্দী প্রাচীন রথযাত্রায় তৃষ্ণার্ত পথিকদের জলসত্রের ব্যবস্থা করেছেন।

পর্বতারোহণ ছিল তাঁর নেশার মধ্যে। হিমালয় পর্বতে তিনি বহুবার গিয়েছেন। Rock climbing প্রশিক্ষণ নিয়েছেন হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন থেকে। তিনি HMI থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছিলেন। 'হিমালয়' পত্রিকার সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি। কিশোরভারতী বিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে তাঁর নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে ১৯৮৮ সালে খেলু পর্বত এবং ১৯৮৯ সালে ভানটি পর্বত অভিযান দারুণ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়। দীর্ঘ সময় জুড়ে ছাত্রদের নিয়ে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি। আকাশের তারা, নানা ধরনের পাখি ও বিভিন্ন গাছপালা চেনানো ছিল তাঁর অন্যতম আকর্ষণ। প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর তাঁর লেখা একাধিক পুস্তক রয়েছে। তিনি দমদম আঞ্চলিক ব্রতচারী নায়কমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। দমদম কিশোরভারতী উচ্চ বিদ্যালয় ও কিশোরভারতী প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ার পর শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক স্কুল তৈরি করেন। রাবীন্দ্রিক ভাবধারায় তিনি গড়ে তোলেন পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডিতে কিশোরভারতী আশ্রম বিদ্যালয় ও কাশীপুর কিশোরভারতী বিদ্যালয়। এছাড়াও বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের ছাঁচনপুরে আদিবাসীদের মধ্যে গড়ে তোলেন লক্ষ্মী মূর্মু স্মৃতি বিদ্যালয়।

মিহির সেনগুপ্ত গোবরডাঙ্গায় কপিলেশ্বরপুরে ও দেওড়ায় রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম নামক বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও শিক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শ দান করেছেন, সেখানে দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও গড়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কিশোরভারতী উন্নয়ন সংস্থা আর্থিক সাহায্য করেছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় সাইথলের আদিবাসী গ্রামে 'কিশলয়' বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিচালনায় তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। নদীয়ার উষাগ্রামে ট্রাস্টের একটি বিদ্যালয়ে মুক্ত বিদ্যালয়ের চিন্তাভাবনায় তিনি দীর্ঘসময় বিনা বেতনে পাঠদান করেছেন। পশ্চিম বর্ধমানে মাঝিড়ায় একটি বিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে তিনি প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। গ্রামীণ শিক্ষাপ্রসারের লক্ষ্যে গোবরডাঙ্গায় আর একটি রবীন্দ্রভাবনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার বীজ রোপণ করেছিলেন। কিন্তু জীবনসায়াহ্নে বার্ধক্যজনিত দারুণ অসুস্থতার কারণে সেটি আর সম্পন্ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন আলোচনায় নানা স্থানে তিনি সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেছেন। কিশোরভারতী উন্নয়ন সংস্থার মুখপত্র 'শিক্ষাবার্তা'র তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাংলা মাধ্যমে যে আদর্শ বিদ্যালয় গড়া যায় তারপ্রমাণ কিশোরভারতী বিদ্যালয়, যার যোগ্য নেতৃত্বে ছিলেন মিহির সেনগুপ্ত। তাঁর ঋজু ব্যক্তিত্ব এবং অপরিবর্তনীয় ও আপসবিহীন নীতিনিষ্ঠ জীবন বহু সংখ্যক মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি অতীব উদার মানবিকতায় আস্থাশীল ছিলেন। কোনভাবেই মানুষের খণ্ডিত অবয়ব তিনি মানতেন না। শিক্ষা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উপর ভিত্তি করে আর এস পি দলের নীতি আদর্শে জীবনের শেষ মুহূর্তেও অবিচল ছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন ভারতবর্ষে শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

আর এস পি'র পূর্বতন প্রবাদপ্রতিম নেতৃত্বের সাথে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। দমদমে মার্কসবাদী চিন্তাবিদ অধ্যাপক সরোজ সেনের সাথে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক ছিল। কম. মাখন পাল, কম. ননী ভট্টাচার্য যখন সরোজ সেনের বাড়িতে আসতেন তখন রাজনৈতিক আলোচনায় মিহির সেনগুপ্ত অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন। কম. ত্রিদিব চৌধুরীর নির্বাচনে প্রতিবারই মিহির সেনগুপ্তর ডাক পড়তো। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে মুর্শিদাবাদে পৌঁছে এক সাধারণ সংগঠক হিসেবেই নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতেন।

কলকাতার বড়তলায় কম. নিখিল দাসের নির্বাচনেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। দলের সদস্যদের নিয়ে তিনি বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক ক্লাস করেছেন। কিছুদিন আগে অসুস্থ শরীরেও দলের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। নিয়মিত 'গণবার্তা' পত্রিকা নিতেন ও পড়তেন। দলের খবর প্রতিনিয়ত রাখতেন। শিক্ষা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার নিরিখে তাঁর সুবিশাল কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি সুদূরপ্রসারী। এসবের তুলনার অংশীদারী উনি নিজেই। এক বিশাল মহীরূহের পতনের সাথে সাথে একটা যুগের অবসান হলো। তাঁর প্রয়াণে দলের ও বামপন্থী আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। আমরা হারালাম প্রকৃত মার্কসবাদী লেনিনবাদী একজন অভিভাবককে। তাঁর প্রয়াণে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা পূরণ করা সহজ নয়, তবে আস্থা আছে তাঁর অগণিত ছাত্র ও সহগামী মানুষরা ঐক্যবদ্ধ হবেন এবং কম. মিহির সেনগুপ্তর জীবনাদর্শকে দীর্ঘস্থায়ী করার প্রয়াস গ্রহণ করবেন।

কম. মিহির সেনগুপ্ত লাল সেলাম।
কম. মিহির সেনগুপ্ত অমর রহে।।

অধ্যাপক সৌরীন ভট্টাচার্য স্মরণ কমিটি

৩০ জানুয়ারি (সোমবার) বিকেল ৫টায়

যাদবপুরের 'ইন্দুমতী সভাগৃহে'

কম. সৌরীন ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা

বিষয়ঃ **ইতিহাসের বিকৃতি—প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রিক**

বক্তাঃ **অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত**

মুখবন্ধ করবেনঃ **কমরেড মনোজ ভট্টাচার্য**

সভাপতিঃ **অধ্যাপক ড. তুষার চক্রবর্তী**

প্রবেশ অবাধ

উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে আর এস পি'র কর্মীসভা

গত ৮ জানুয়ারি ইসলামপুর শহরের টাউন লাইব্রেরি হলে আঞ্চলিক আর এস পি'র উদ্যোগে একটি সুসংগঠিত কর্মীসভা আয়োজিত হয়। এই সভার মুখ্য উদ্যোক্তা শহরের বর্ষীয়ান আর এস পি নেতা কমরেড বন্ধন দাস। তিনি এবং আর এস পি ইসলামপুরের সমস্ত সদস্যরা বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে এই কর্মীসভা সংগঠিত করেন। হাড় কাঁপানো শৈত্য প্রবাহকে অস্বীকার করে শত শত কমরেড ধৈর্য এবং শৃংখলার সঙ্গে দীর্ঘসময়ব্যাপী সভায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন ইসলামপুর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কম. জহিরুদ্দিন। প্রারম্ভিক বক্তব্য পেশ করেন আর এস পি উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক কম. ভাসান রায়, কম. বন্ধন দাস এবং যুব নেতা কম. দেবব্রত কর। কম. কর তাঁর উদাত্ত ভাষণে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামপন্থীদের দায়িত্ব সম্পর্কে বিশদে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস দলের সমস্ত স্তরে যেভাবে দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে এবং তার বিরুদ্ধে যে দলে দলে মানুষ প্রতিবাদী সে সম্পর্কেও উল্লেখ করেন।

এই কর্মীসভার মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর এস পি'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কম. মনোজ ভট্টাচার্য। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে বর্তমান সময়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে বলেন যে, উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক অপশক্তি আর এস এস ও তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি সারা দেশের মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে চলেছে। ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষের প্রসার ঘটিয়ে চলেছে। ফ্যাসিবাদী জঙ্গি হিন্দুত্ববাদী আর এস এস দেশের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সংহতি ধ্বংস করার অবিরাম অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। এই রাজ্যের শাসকদল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস আর এস এস এর কাছে আত্মসমর্পণ করে চলেছে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই উভয় অপশক্তিকে পর্যুদস্ত করতে অন্যান্য বামপন্থী দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আমাদের দলকে শর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন যে, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারই সমস্ত জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি করে চলেছে। দুর্নীতির ব্যাপক কুপ্রভাবে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করছে। সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির স্বার্থে নয়া উদারবাদী ব্যবস্থার বাস্তবায়নে উভয় দলই ক্রিয়াশীল। গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি বিধ্বস্ত করা হচ্ছে। দেশে নারীর সম্মান বিপর্যস্ত এবং নারী সমাজের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক হিংসা ও নির্যাতন চলছে। এই অপব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

ধানের অভাবী বিক্রি ঃ হুগলী জেলাশাসককে স্মারকলিপি দিল আর এস পি

রাজ্য সরকারের ধান কেনা নিয়ে ঢক্কানিনাদ বা প্রচারের শেষ নেই। বাস্তবে অধিকাংশ কৃষক এই মরশুমেও লোকসানে ধান বেচতে বাধ্য হচ্ছেন। গত মরশুমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আমন ধানের বিপুল ক্ষতি হয়েছিল। অতিবৃষ্টি, তারপরে জাওয়াদের বৃষ্টিতে অনেকের ধান নষ্ট হয়। এই মরশুমে কম বৃষ্টিতে ফলন কমেছে। বেড়েছে চাষের খরচ, পাশাপাশি ফলন কমেছে।

বর্তমান মরশুমে সরকারি সহায়ক মূল্য গতবারের থেকে কুইন্টালে বেড়েছে মাত্র ১০০ টাকা। অথচ, চাষের খরচ বেড়েছে বহুগুণ। আবার সরকারের নিয়মে সরকারের কাছে ধান বেচার সুযোগ অধিকাংশ কৃষকই পান না।

বর্তমান মরশুমে যেখানে ধানের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কুইন্টালে ২০৪০ টাকা (সরকারি ক্রয় কেন্দ্রে বাড়তি ২০ টাকা), সেখানে অধিকাংশ কৃষক কুইন্টালে ১৬০০ টাকাও দাম পাচ্ছেন না। আবার সরকারি কেন্দ্রে বিক্রি করেও অনেকের লাভ হচ্ছে না। প্রত্যেক কৃষককে সরকারের কাছে ধান বিক্রির সুযোগ, সহায়ক মূল্যবৃদ্ধি সহ চার দফা দাবিতে গত ২৯ ডিসেম্বর আর এস পি হুগলি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসকের দপ্তরে প্রতিনিধি আকারে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দাবিগুলি হল—

(১) ভাগ, চুক্তি, ভাড়াটে জমি বন্ধক নিয়ে চাষ করা বা পাট্টা না পাওয়া খাসজমির কৃষকদের থেকেও সরকারকে ধান কিনতে হবে। তার জন্য নাম নথিভুক্ত করার নিয়ম বদলাতে হবে এবং প্রকৃত কৃষকদের চিহ্নিত করতে হবে। (২) প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্র করতে হবে। (৩) ধানের সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে, স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে, কৃষি উৎপাদনে খরচের দেড়গুণ দাম নিশ্চিত করতে হবে। (৪) প্রকৃত কৃষকদের কৃষক বন্ধু, কৃষি ঋণসহ সরকারি সুযোগগুলি থেকে বঞ্চিত করা চলবে না।

এর প্রতিলিপি জেলা কৃষি এবং খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরেও দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে ধান ও পাট ছাড়া অন্য কোনো ফসল সহায়ক মূল্যে কেনার সরকারি ব্যবস্থা নেই। তাও সরকারি নিয়ম ও নথির জটিলতায় সেই সুযোগও অধিকাংশ কৃষক পান না। সরকারি নিয়মে জমি যার, সরকারের কাছে ধান বিক্রির সুযোগ তার। নাম নথিভুক্ত করতে চাই জমির কাগজ। তাই ভাগ, চুক্তি, অন্যের জমি ভাড়া বা বন্ধক নিয়ে চাষ করা কৃষক সরকারের কাছে ধান বেচতে পারেন না। জমির মালিকানার কাগজ নিয়ে চাষ না করেও অনেকে দিব্যি সহায়ক মূল্যে ধান বেচে লাভ করছেন। কৃষক বন্ধু, কৃষি ঋণের সুবিধা পাচ্ছেন। রাজ্যের প্রান্তিক কৃষকদের অবস্থাও করুণ। মহাজনের কাছে ধার বা দাদন নেওয়ায় তাঁদের কাছে অভাবী বিক্রিতে বাধ্য হন। নিজের অল্প জমিতে চাষ করা কৃষকই আবার অন্যের জমিতে ভাগে চাষ করেন বা ক্ষেত মজুরি করেন। জমির মালিকানা থাকলেও অনেক প্রান্তিক কৃষক সরকারি মূল্যে ধান বেচতে পারেন না। হুগলী জেলায় এই মরশুমে আমন ধানের শুধুমাত্র কৃষি উপকরণেই বিঘে প্রতি খরচ হয়েছে, মোটামুটি ১৪০০০- ১৫০০০ টাকা। গড় হিসেবে দেখা যাচ্ছে, বীজ ৩০০ টাকা + সার ১৩০০ টাকা + কীটনাশক ২৫০০ টাকা + সেচ ১৪০০ টাকা + শ্রমের দাম ৭০০০ টাকা + ট্রাক্টর ২০০০ টাকা = ১৪৫০০ টাকা। এর ওপর আছে ধারের সুদ। অনেককেই উচ্চ সুদের হারে মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানি বা মহাজনের থেকে ধার নিতে হয়। অনেককে ৩৬ শতাংশ বার্ষিক সুদের হারে মহাজনী ঋণ নিতে হয়। অনেকেরই খরচ তাই বিঘে প্রতি ১৮০০০ টাকার বেশি। সরকার বাহাদুর সবাই জানে। কিন্তু সহায়ক মূল্য ঠিক করতে এসব হিসেব করে না। যেমন হিসেবে আনে না, সার, কীটনাশকের কালোবাজারি। কৃষক উল্লিখিত এম আর পি-তে এসব কিনতে পারেন না। দিতে হয় বেশি দাম। সরকার সেই দাম হিসেবে না এনে, চাষের খরচের হিসেব কমায়। তাই সহায়ক মূল্যও কম হয়।

এবারে ধানের ফলন গড়ে ১২ বস্তা (৬০ কেজিতে এক বস্তা হিসেবে) বা ৭২০ কেজি। অর্থাৎ, অনেকের খরচ কেজি প্রতি ২৩ থেকে ২৪ টাকা বা তার বেশি। ভাগচাষিকে সাধারণত ফলনের সিকি ভাগ জমির মালিককে দিতে হয়। তাহলে তার হাতে থাকবে মাত্র ৯ বস্তা ধান। আবার, চুক্তি চাষিকে ফলন যাই হোক, চুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট বস্তা ধান বা তার দাম জমির মালিককে দিতে হয়। ২ বস্তা ধান দেওয়ার চুক্তি থাকলে তাহলে চাষি পাচ্ছেন ১০ বস্তা ধান। জমি ভাড়া বা বন্ধক নিয়ে চাষ করলেও অনেক খরচ। এই মরশুমে অনেকেই কেজি প্রতি ১৬ টাকারও কম দামে (বস্তায় ৯৪০-৯৫০ টাকা) ধান বেচতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেকে আবার বস্তায় ৯২০ টাকা দরেও বেচেছেন। একজন ভাগ চাষির খরচ যদি বিঘে প্রতি ১৮০০০ টাকার বেশি হয়, (তাঁকে মাইক্রোফিন্যান্স বা মহাজনী ঋণেই নির্ভর করতে হয়) ৯ বস্তা ধান তিনি বিক্রি করে ৯৫০ টাকা বস্তায় পাবেন, ৮৫৫০ টাকা। চুক্তি চাষি ১০ বস্তা বেচলে পাবেন ৯৫০০ টাকা। খরচের অর্ধেক দামও অনেকে পাচ্ছেন না। প্রান্তিক কৃষকেরও বিপুল ক্ষতি হচ্ছে। আবার সরকারি সহায়ক মূল্যে বেচলেও অনেকের লোকসান হচ্ছে। কারণ সরকারি কেন্দ্রে কেনার সময় কুইন্টালে ৭-৮ কেজি ধান বাদ দেওয়া হয়। সরকার নির্দিষ্ট কেনার জায়গায় ধান নিয়ে যাওয়ার খরচও রয়েছে। অনেক কৃষকই তাই লাভের আশায় নয়, নিজেদের পরিবারের খাবার জোটাতে ধান চাষ করেন। নয়া প্রজন্ম চাষের আগ্রহ হারিয়ে শ্রমিক হচ্ছেন। আর এই সুযোগেই কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ দখলে হানা দিচ্ছে কর্পোরেট দানবেরা। আর এস পি প্রতিনিধিদলে ছিলেন জেলা সম্পাদক কম. মৃন্ময় সেনগুপ্ত, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. কিশোর সিং এবং অরুণ দাস।

বাসন্তীতে ধর্ষিতার বাড়িতে নিখিলবঙ্গ মহিলা সঙ্ঘ

গত ৪ ডিসেম্বর বাসন্তীতে ঘটে গেলো নৃশংস ঘটনা, মাত্র নয় বছরের শিশুকে দুদিন ঘরের মধ্যে আটকে রেখে ধর্ষণ করে ঘরের মেঝেতেই পুঁতে দিল প্রতিবেশী। শিশুটির পরিবারের কাছ থেকে ওইদিন স্কুলে যাওয়ার পর নিখোঁজ হয়ে যায় শিশুটি। পাড়ার সমস্ত জায়গায়, এমনকি পুকুরে জাল ফেলে খোঁজ করার পরও পাওয়া যায়নি বাচ্চাটিকে। পরিবারের তরফ থেকে জানা যায় বাচ্চাটি প্রতিবন্ধী। পরিবার ধর্ষণ করে, খুন করে ওই ছাত্রীকে পুঁতে দেওয়ারও অভিযোগ করল ওই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনাস্থল, বাসন্তী থানার উত্তর আমঝাড়া এলাকা। সেখানেই এমন চতুর্থ শ্রেণির এক পড়ুয়ার সঙ্গে এমন অমানবিক রোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার থেকে দু'দিন ধরে নিখোঁজ ছিল ওই নাবালিকা ছাত্রী। এরপর বাড়ির মেয়েকে খুঁজে না পেয়ে বাসন্তী থানার শিমুলতলা পুলিশ ফাঁড়িতে মৌখিকভাবে অভিযোগ জানায় পরিবার। তদন্তে নামে পুলিশ। বহু খোঁজাখুঁজির পর ওই গ্রামের এক প্রতিবেশীর বাড়ির ঘরের মেঝের মধ্যে থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই শেরাউদ্দিন লস্কর ও তাঁর কাকিমা সাহানারা লস্করকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এরা দু'জনই ওই নাবালিকার প্রতিবেশী। অভিযুক্ত শেরাউদ্দীন লস্কর পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে সে খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এই নৃশংস ঘটনার নিন্দা জানাতে ও অসহায় পরিবারের বাশে থাকতে ৯ জানুয়ারি নির্যাতিতার বাড়িতে যান নিখিলবঙ্গ মহিলা সঙ্ঘের প্রতিনিধিবৃন্দ। শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন নেত্রীবৃন্দ।

বাসন্তীর আমঝাড়া গ্রামে গিয়ে ৮ জানুয়ারি শিশুকন্যার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন আর এস পি-র মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধিরা। মহকুমাশাসকের সঙ্গে দেখা করে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সর্বাণী ভট্টাচার্য, রাজ্য সভানেত্রী সুচেতা বিশ্বাস প্রমুখ পরিবারটির জন্য নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন। মহকুমা শাসকের দপ্তর থেকে সমস্ত সহযোগিতার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। এসডিপিও-র কাছেও তাঁরা সময় চেয়েছিলেন, তবে সাগর মেলার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকায় পুলিশ-কর্তা সময় দিতে পারেননি। মহিলা সঙ্ঘের দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দ্রুত প্রকাশ করতে হবে এবং অবিলম্বে চার্জশিট পেশ করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।

মহিলা সঙ্ঘের নেত্রীবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে নারী সমাজের বিরুদ্ধে যে লাগাতার নির্যাতন ও যৌন আক্রমণ চলছে তার তীব্র সমালোচনা করেন। রাজ্যে তৃণমূল সরকার গঠিত হবার পর থেকেই এমন অমানবিক ঘটনা ঘটে চলেছে বলে মন্তব্য করে নেত্রীবৃন্দ।

উদয়পুর এস ডি এমকে ডেপুটেশন আর এস পি'র

জনগণের সমস্যা সমাধানের দাবিতে লড়াই-এর ময়দানে নেমেছে আর এস পি উদয়পুর শহর অঞ্চল কমিটি। উদয়পুর পুরসভা এলাকায় বাড়ি বাড়ি বিশুদ্ধ পানীয় জল নিয়মিত দুই বেলা দেওয়া, খিলপাড়া, রাজারবাগ, ছাতারিয়া, রাজনগর অঞ্চলে ওভার হেড ট্যাঙ্কের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রদান সহ ১১ দফা দাবি নিয়ে উদয়পুর মহকুমাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে আর এস পি উদয়পুর শহরাঞ্চল কমিটি। গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ এই ডেপুটেশনে তিনজনের প্রতিনিধি দলে ছিলেন আর এস পি উদয়পুর শহরাঞ্চল কমিটির শ্রীকান্ত দত্ত, ভানু লোধ ও দেবদুলাল চক্রবর্তী। বুধবার বিকেলে ডেপুটেশন প্রদানকালে, দাবিসনদে ছিল গোমতী জেলা হাসপাতালে অসুস্থ পরিবেশ দূর করা ও পরিষেবা উন্নত করা। পুরসভা সহ শহর সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ভাঙা রাস্তার ড্রেন মেরামতির ব্যবস্থা করা। পুরসভার টুয়েপ গ্রামের রেগার মাধ্যমে বছরে ২০০ দিন কাজ এবং মজুরি ৩৪০ টাকা করা। প্রতিটি সরকারী বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে গরিব ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। উদয়পুর শহরের জল ও আবর্জনা নিকাশি ব্যবস্থা আধুনিক করা। টেপানিয়া থেকে মাতাবাড়ি পর্যন্ত জাতীয় সড়কে প্রতিটি চৌমুহনীতে স্পিডব্রেকার দেওয়া ও ব্রহ্মবাড়িতে আধুনিক সিগন্যাল ব্যবস্থা করা।

রাজারবাগ, খিলপাড়া, রাজনগর, ছাতারিয়া, গোকুলপুর এলাকার কৃষকদের কৃষিকাজের জন্য সঠিক সময়ে বীজ সার প্রদান করতে হবে। জলসেচ মেশিন দ্রুত সারাই করতে হবে। রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ড ও রমেশ চৌমুহনী মার্কেট শেড আধুনিক করতে হবে। খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক ও দুই নং রেশনশপ নিয়মিত দুই বেলা খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। পুরসভা এলাকাকে চার পাঁচটি জোনে ভাগ করে জোন অফিস করে পরিষেবাকে আরও সহজ ও সরলীকরণ করা। প্রভৃতি দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে আশ্বস্ত করেন উদয়পুর মহকুমাশাসরে আধিকারিক। তিনি জানান, এ বিষয়গুলি তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ত্রিপুরায় শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক নাগরিকদের প্রতি আবেদন

বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার গঠনের পর থেকে ত্রিপুরার বুকে এক অভাবনীয় অস্বাভাবিক অরাজক পরিস্থিতি চলছে। গণতান্ত্রিক অধিকার অপহরণ করা হয়েছে। নাগরিক স্বাধীনতা আক্রান্ত। সংবাদ মাধ্যমের স্বাতন্ত্র বিপর্যস্ত। বিরোধী দল সমূহের কণ্ঠরোধ করে তাদের স্বাধীন কর্মধারা স্তব্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কার্যত স্বৈরশাসন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাগরিকদের স্বাধীন ভাবে ভোট দেবার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছে। প্রশাসন এবং বিশেষভাবে পুলিশের একাংশের নিষ্ক্রিয়তা শাসক দলকে তাদের সংবিধান বিরোধী অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমকে সহায়তা করছে, শাসকদলের প্রশ্রয়পুষ্ট দুর্বৃত্তদের উৎসাহিত করছে। ফ্যাসিস্টসুলভ কায়দায় চালানো হচ্ছে খুন, সন্ত্রাস, লুঠতরাজ, বলপূর্বক অর্থ আদায় এবং মানুষের খেয়ে পরে পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকার উৎসগুলোকেই ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। স্থানে স্থানে মানুষকে জন্মস্থান তথা পৈত্রিক ভিটেমাটি গ্রাম ও রাজ্যছাড়া করে দেওয়া হচ্ছে। মা-বোনদের বিরুদ্ধে অপরাধ বীভৎস চেহারা নিয়েছে। শাসক দলের অনুরাগী ও মদতপুষ্ট বলে পুলিশ প্রকৃত অপরাধীদের কেশাগ্রহ স্পর্শ করছে না। উলটে আক্রান্তদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলার পাহাড় তৈরি করে চলেছে। আইনের স্থান দখল করেছে জঙ্গলের শাসন। প্রকৃতঅর্থে ত্রিপুরায় দেশের সংবিধান আজ অচল।

এই পরিস্থিতিকে ত্রিপুরার শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক মানুষ মেনে নিতে পারেন না বলেই ত্রিপুরায় অন্ধকারের রাজত্ব কায়েম করার বিরুদ্ধে দল-মত-ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে উঠে সকল মানুষকে স্বতঃস্ফূর্ত ও ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে এবং এর অবসানে এগিয়ে আসতে আন্তরিকভাবে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন সি পি আই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী, আর এস পি'র রাজ্য সম্পাদক দীপক দেব, সি পি আই-এর রাজ্য সম্পাদক বীরজিৎ সিংহ, ফরোয়ার্ড ব্লকের রাজ্য চেয়ারম্যান পরেশ সরকার এবং জাতীয় কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক পার্থ সরকার। সাধারণ প্রশাসন ও বিশেষভাবে পুলিশ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়ে কঠোরভাবে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করার লক্ষ্যে ত্রিপুরাবাসীদের কাছে আবেদন করেছেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের মুখে নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ জানাচ্ছি সুস্থ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচকদের স্বাধীনভাবে নিজের ভোটদানের অধিকার নিশ্চিত করতে এখনি ফলপ্রসূ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবিকে সামনে রেখে আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছেন। সংঘ পরিবারচালিত রাজ্যের শাসক দল বিজেপি'র বিরুদ্ধে রাজ্যের বামশক্তিকে অক্ষ করে জাতীয় কংগ্রেস সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছে সি পি আই (এম), আর এস পি, সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ।

আবাস যোজনার দুর্নীতি নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য তরজা : সাধারণ মানুষের মত দেওয়ার সুযোগ কোথায়?

মৃন্ময় সেনগুপ্ত

আবাস যোজনা নিয়ে তৃণমূলের চরম দুর্নীতি আর আড়াল করা যাচ্ছে না। কাঁচা, কোনক্রমে মাথা গোঁজার ঠাঁই করা বাড়িতে বাস করা বহু গরিব মানুষের নাম তালিকায় ওঠেনি। আবার বিশালাকার, তিন-চার তলার বাড়ির মালিকও নিকটাত্মীয়ের নামে বাড়ি তৈরির সুযোগ পাচ্ছেন। এদের সিংহভাগই হয় শাসক দলের নেতা, নয়তো নেতার নিকটাত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ। এদের অনেকেই আবার পঞ্চায়েতের মাতব্বর। বেনিয়মের কথা সরকারের ধামাধরা সংবাদমাধ্যমগুলিও প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেকের যুক্তি আবদনের সময়ে তাঁদের নাকি কাঁচা বাড়ি ছিল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে কাঁচা থেকে তাঁরা কীভাবে বিশালাকার বাড়ির মালিক হলেন, সে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে তৃণমূলের সর্বব্যাপ্ত দুর্নীতির এরচেয়ে বড় প্রমাণই বা আর কী হতে পারে!

বিজেপি বাজার গরমের চেষ্টায় ময়দানে নেমেছে। যদিও, মিডিয়ায় হম্বিতম্বি, হাস্যকর উক্তি, সরকার বদলে যাওয়ার ডেটলাইনের নাটুকেপনাতেই তাদের আন্দোলন প্রধানত সীমাবদ্ধ। অনিয়মের তালিকায় বহু বিজেপি নেতা ও পঞ্চায়েতের মাতব্বরের নামও আছে। একদা তৃণমূলের নেতা হয়ে এসব দুষ্কর্ম করে এখনও অনেকেই দলবদলে বিজেপি নেতা হয়েছেন। দুর্নীতিগ্রস্ত এসব দলবদলু নেতা আর কতদূর আন্দোলন করতে পারবেন? কেবল গ্রাম নয় শহরাঞ্চলেও দুর্নীতির একই চিত্র। কাটমানি ছাড়া আবাস যোজনার তালিকায় নাম ওঠার ঘটনা বিরল। আবার, নির্দিষ্ট ঠিকাদারকে দিয়ে কাজ করানো অনেকক্ষেত্রেই একপ্রকার বাধ্যতামূলক। নাহলে প্রথম বারের পর টাকা আসে না। এই ঠিকেদাররা কেবল শাসকদলের ঘনিষ্ঠই নন, তাঁদের নজরানার টাকা আবার জমা পড়ে ওপর মহলে।

কেন্দ্রীয় সরকার নাকি দুর্নীতি দমনে আসরে নেমেছে। তা নিয়ে চলছে, কেন্দ্র-রাজ্য তরজা। কেন্দ্র দিচ্ছে অর্থ আটকে রাখার হুমকি। রাজ্য বলছে কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা। অর্থ আটকে ক্ষমতা দেখিয়ে কেন্দ্র আসলে কাদের বঞ্চিত করছেন? দুর্নীতিগ্রস্ত রাজ্য প্রশাসন বা পঞ্চায়েতগুলির কর্তা ব্যক্তিরা শাস্তি পাচ্ছেন না। পাচ্ছেন রাজ্যের গরিব মানুষ। তৃণমূলের দুর্নীতির দায় তাঁদের বহন করতে হবে কেন? একশো দিনের কাজেও এক অবস্থা। এক বছরের ওপর রাজ্যে কাজ বন্ধ। সাধারণ মানুষই এতে বঞ্চিত হচ্ছেন। অথচ, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন অনুসারে কেন্দ্র-রাজ্য কোনো সরকারই তা পারে না। কাজ না পেলে ভাতা পাওয়া আইনি অধিকার। দুই সরকারই আইন লঙ্ঘন করছে।

আবাস যোজনার ক্ষেত্রেও একই চিত্র। অনুসন্ধানের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি ও আশা কর্মীদের আপত্তি সত্ত্বেও পাঠানো হচ্ছে। যাচ্ছেন, পুলিশ, ব্লকের আধিকারিকরা। আবার কেন্দ্রীয় টিমও বেশ কয়েক জায়গায় যাচ্ছে। এই কর্মযজ্ঞে সাধারণ মানুষের ঠাঁই নেই। অথচ, পঞ্চায়েত, আইন অনুসারে সেটাই হওয়ার কথা।

কেন্দ্র-রাজ্য তরজায় আড়াল হয়ে যাচ্ছে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের অধিকারের প্রসঙ্গ। সাধারণ মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণের রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার। সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে গ্রামবাসীকে যা দেওয়া হয়েছিল। বাস্তবে সবাই যেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। তারা গরীব মানুষকে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে, আবার দুর্নীতিবাজদের শিক্ষাও দিতে পারে। মানুষের সিদ্ধান্ত নেওয়া তো দূরের কথা, মতামত জানানোরও কোনো অধিকার নেই। অথচ, পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ঠিক উল্টো হওয়ার কথা। সংবিধান, আইনের সঙ্গে বাস্তবের ফারাক শত যোজন।

পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯৯২ সালের সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনী সে লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। যা পঞ্চায়েতকে তৃতীয় স্তরের সরকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। আমলাতন্ত্রকে কিছুটা হলেও গৌণ করে সাধারণ মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণ গুরুত্ব পেয়েছে। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ছিল এই সংশোধনীর অনুপ্রেরণা। রাজ্যের পঞ্চায়েত আইনও তার অনুসারী। আইন অনুসারে, পঞ্চায়েতের কাজে মানুষের সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য গ্রাম সংসদ, গ্রামসভা, পাড়া বৈঠক, সামাজিক নিরীক্ষা ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তৃণমূলের আমলের সরকারি বইগুলিতেও সেই কথা বলা হয়েছে।

২০১৫ সালে রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের 'গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা : রচনা ও রূপায়ণের নির্দেশিকায় বলা হয় যে, জনসাধারণই পঞ্চায়েতের উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল কর্মকর্তা। নির্বাচিত প্রতিনিধি বা সরকারি কর্তারা সহযোগিতার ভূমিকা পালন করবেন (পৃ: ১১)। সরকারি পরিভাষায় একে বলা হচ্ছে সহভাগী উন্নয়ন ও পরিকল্পনা। ২০১৮ সালে রাজ্য সরকার নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। নাম : গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ও পদাধিকারীদের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে পাঠোপকরণ, ২০১৮। অর্থাৎ, বিগত পঞ্চায়েত ভোটে নির্বাচিতদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যেই এই পুস্তিকা। প্রথম খণ্ডে গ্রাম সভা, গ্রাম সংসদ, সামাজিক নিরীক্ষা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত আইন অনুসারে, গ্রাম পঞ্চায়েতের একেকটি বুথের সকল ভোটার নিয়ে একেকটি গ্রাম সংসদ গঠিত হয়। বছরে কমপক্ষে দুটি গ্রাম সংসদের সভা করা আবশ্যক। মে মাসে বার্ষিক ও নভেম্বর মাসে যান্মাষিক সভা। প্রয়োজনে বিশেষ গ্রাম সংসদ সভা করার সুযোগ রয়েছে। এই সভাগুলিতে সেই বুথের সব ভোটারের অংশগ্রহণের অধিকার আছে। গ্রাম সংসদের বার্ষিক সভায় বিগত আর্থিক বছরের বাজেট, বিগত এক বছরের হিসেব, পঞ্চায়েতের কাজের মূল্যায়ন, বিভিন্ন প্রকল্পে যারা সুবিধা পেয়েছেন তাঁদের তালিকা, চলতি বছরের কাজ ও পরের বছরে কী কী কাজ হবে সেসব আলোচনা করতে বিভিন্ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের তালিকা ইত্যাদি পেশ করে গ্রামবাসীদের এগুলি নিয়ে আলোচনার সুযোগ দিতে হয়। কেবল পঞ্চায়েতের মাতব্বরেরা এখানে তথ্য জানাবেন না। সাধারণ মানুষ মতামত দেবেন। তাঁদের মতামত ও অনুমোদন গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটারদের নিয়ে গ্রামসভা। প্রত্যেক বছরের ডিসেম্বর মাসে গ্রামসভা করা আবশ্যক। একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সব ভোটার সেই সভায় যোগ দিতে পারবেন। গ্রামসভায় গ্রাম সংসদের সভার আলোচ্য বিষয়গুলি নিয়ে তাঁরা মতামত দিতে পারবেন। এই সভার সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েতে পেশ করতে হবে। গ্রামসভায় পরের বছরের পঞ্চায়েতের বাজেট, সার্বিক পরিকল্পনা, অডিট রিপোর্ট, আয়-ব্যয়ের হিসেব, কাজের হিসেব, বিভিন্ন প্রকল্পে কারা সুবিধা পেয়েছেন, তাঁদের তালিকা গ্রামবাসীদের সামনে অবশ্যই পেশ করতে হবে। আইন অনুযায়ী গ্রামবাসীরা এগুলি নিয়ে মতামত জানাতে পারবেন এবং তাঁদের মতামত লিখে রাখতে পঞ্চায়েত বাধ্য।

গ্রাম সংসদ ও গ্রাম সভার বৈঠকে যাতে সব গ্রামবাসী যোগ দিতে পারেন তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের। গ্রাম পঞ্চায়েতকে অন্তত সাতদিন আগে সভার নোটিশ জারি করে, মাইক প্রচার, লিফলেট বিলি, দেওয়াল লিখন ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের কাছে সভার খবর জানাতে হবে। সঠিকভাবে প্রচার না করে চুপিসারে সভা করা আইনসম্মত নয়। (পৃ: ২৩-২৫)।

গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য সামাজিক নিরীক্ষা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক গ্রামবাসী এই নিরীক্ষায় মতামত জানানোর, পরিকল্পনা করার অধিকারী। মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (একশো দিনের কাজ), প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জাতীয় সামাজিক সহায়তা প্রকল্প, খাদ্যবন্টন (রেশন) প্রকল্পের জন্য সামাজিক নিরীক্ষা হবে। সামাজিক নিরীক্ষার জন্য পাড়া বৈঠক এবং বিশেষ গ্রামসভা করতে হবে। জনশুনানি সভাও হবে। এইসব প্রকল্পের সুফল কারা পেয়েছেন ও ভবিষ্যতে কারা পাবেন সেসব সম্পর্কে তথ্য জেনে, মতামত দিয়ে পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের আইনি অধিকার সব গ্রামবাসীর রয়েছে। (পৃ: ৬৭-৭০)।

মনে করার কোনো কারণ নেই, তৃণমূল সরকার এইসব অধিকার দিয়েছে। প্রধানত তাদের ক্ষমতায় আসার আগেই গ্রামবাসীরা এই আইনি অধিকারগুলি পেয়েছেন। আইন অনুসারে বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধে পাওয়ার জন্য মানুষকে সরকার বা শাসক দলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার কথা নয়। বরং, প্রশাসনকেই সাধারণ মানুষের মতামতের ওপর নির্ভর করে চলার কথা। কোনো সরকারি প্রকল্পই প্রশাসন বা শাসকের ভিক্ষার দান নয়। অথচ আইন বইয়ের পাতাতেই থেকে যায়। পঞ্চায়েতের মাথারা এসব আইন বিলক্ষণ জানেন। নিয়ম করে তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও হয়। প্রশিক্ষণের নামে মোচ্ছব কম হয় না। মাতব্বরেরা আইন যেমন বোঝেন, তার থেকেও ভালো বোঝেন আইনের ফাঁকগুলো। খাতায় সব সভা হয়ে যায়। অনেকক্ষেত্রেই মানুষ ঠিকমতো জানতেও পারে না। জানলেও স্বাধীন মতপ্রকাশের সুযোগ বাস্তবে নেই। সেখানেও প্রতিবাদ করা মানেই বঞ্চনার শিকার। তাই শাসক দলের নেতারা বুক ফুলিয়ে বলতে পারেন যে, তাঁদের সুরে সুর না মেলালে কিচ্ছু মিলবে না। এত বিতর্কের মধ্যেও জনৈকা পঞ্চায়েত প্রধান প্রকাশ্য সভায়, শাসক দল না করলে বাড়ি পাওয়া যাবে না বলে হুমকিও দিয়েছেন। অথচ, আইন অনুসারে উল্টোটাই হওয়ার কথা। মানুষের মত নিয়েই মাতব্বরদের চলার কথা। সেই কাজ করলে আবাস যোজনা নিয়ে এত ক্ষোভ জন্মাত না।

'সহভাগী উন্নয়নে' সাধারণ মানুষ আজ আর কর্মকর্তা নন। মাতব্বররাই বাস্তবে সব করছেন। সাধারণ মানুষ বাস্তবে কেবল অনুগ্রহ প্রার্থী। তাই যখন দুর্নীতি, অনিয়ম রুখতে সরকারি কর্তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়, তখন মানুষ বিশেষ আপত্তি করেন না। শাসক দলের রাজকুমার (যিনি রাজ্য প্রশাসনে যুক্তই নন) পঞ্চায়েত প্রধানকে পদত্যাগের আদেশ দিলে, প্রশ্ন তোলেন না। বরং অনেকেই খুশি হন। চোখের সামনে দেখা দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষমতাবানের শাস্তি অনেক বেশি উপভোগ্য। পঞ্চায়েতে যদি সত্যি মানুষের অংশগ্রহণের, কর্মকর্তা হওয়ার সুযোগ থাকতো, তাহলে নির্বাচিত প্রতিনিধি এমনভাবে পদ ছাড়তে বাধ্য হতেন না। মানুষের বদলে সরকারি ও শাসক দলের কর্তারাও মাতব্বরির সুযোগ পেতেন না।

বামফ্রন্টের আমলে সব কিছু মোটেই ঠিকমতো চলতো না। দলের মাতব্বরি পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্যকে অনেকখানিই ব্যর্থ করেছে। যা হতে পারত, গণতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত, যা গড়ে তুলতে পারত বামেদের পাকাপোক্ত জনভিত্তি, তাই বাস্তবে মানুষের ক্ষোভের অন্যতম কারণ হয়েছিল। বর্তমানে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় শাসক দলই মতাদর্শগতভাবে গণতন্ত্রের বিস্তার চায় না। সুশাসনের নামে গণতন্ত্রের পরিসর ক্রমশ সঙ্কুচিত করে আমলাতন্ত্র ও কর্পোরেটতন্ত্রের ভিত মজবুত করাই যাদের মতাদর্শ। এই মতাদর্শ নয়া উদারনীতির। তাই পঞ্চায়েতের দুর্নীতি নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য তরজায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বা 'সহভাগী উন্নয়ন' স্থান পায় না।

আবাস যোজনার দুর্নীতি নিয়ে বামেরা রাস্তায় নেমেছে। বঞ্চিত গরিব মানুষের লড়াইয়ের মেজাজ দেখা যাচ্ছে। পুলিশ ও তৃণমূলের আক্রমণেও তাকে দমানো যাচ্ছে না। অনেক অঞ্চলে মানুষের ক্ষোভে গ্রামসভার বৈঠক পর্যন্ত বন্ধ করতে পঞ্চায়েত বাধ্য হয়েছে। যে গ্রামসভার বৈঠকে সাধারণ মানুষের ঠাঁই নেই, সেগুলিই হয়ে উঠছে প্রতিবাদের মঞ্চ। বামেদের আন্দোলনে গ্রাম সংসদ ও গ্রামসভার বৈঠক নিয়ম মেনে করার দাবি উঠে আসছে। যা আসলে অংশগ্রহণকারী গণতন্ত্রের দাবি। দুই স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইতে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের দাবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যে আইনি অধিকার মানুষকে দিয়েছে তা নিয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা আজ বড় কাজ। সেই কাজ তৃণমূল স্তরে এক সচেতন রাজনৈতিক সমাজ গড়তে পারে। প্রান্তিক মানুষের মধ্যে সামূহিক সচেতনতার মধ্য দিয়ে, নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারে। পঞ্চায়েতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইকে সেই স্তরে উন্নীত করার মধ্যেই রয়েছে, বামেদের আগামীদিনে জনভিত্তি পুনর্গঠনের চাবিকাঠি।

কোভিড প্রতিরোধে চিন বিরোধী অবস্থানের জন্য চিন সরকারের তীব্র সমালোচনা

বেজিং, সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের দেশগুলিতে চিন থেকে আগত যাত্রীদের উপর উনিশ রকমের পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। চিন সরকার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, চিনকে উপলক্ষ করে যে সব বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে তাঁর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। চিন সরকার পশ্চিমী দেশগুলি আরোপিত এত সব কোভিড প্রতিরোধের বিধিনিষেধগুলিকে মান্যতা দিতে পারে না। চিনের বক্তব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই কোভিড প্রতিরোধে ওরা এমন অবস্থান গ্রহণ করেছে, এবং তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে অবিলম্বে এই বিধিনিষেধগুলি প্রত্যাহৃত না হলে, কিন্তু পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রসঙ্গত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, ভারত চিন থেকে আগত যাত্রীদের উপর কোভিড প্রতিরোধে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের ঘোষণা করেছে।

Vol. 70 Issue No. 22 শনিবার ৭ জানুয়ারী, ১৪ জানুয়ারী ২০২৩ আট
RN No. 2710/57 Rupees Five [By Air Rs. 6.50]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com

গণবার্তা

Postal Regd. No. SSRM/KOL.-RMS/W.B./R.N.P. 206/2007-09
Licenced to post without pre-payment/Licence No. MM & PO/
SSRM-KOL-RMS/R.N.P. 206/LPWP 042/2007-09

স্যান্টোস, ব্রাজিল ও পৃথিবীর পেলে

সুমিত গাঙ্গুলী

এডিসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তো—ডাকনাম পেলে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের একজন হিসাবে বিবেচিত এবং ফিফা কর্তৃক ''সর্বশ্রেষ্ঠ'' হিসেবে চিহ্নিত, তিনি বিশ শতকের সবচেয়ে সফল এবং জনপ্রিয় ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব। প্রয়াত হয়েছেন মাত্র কিছুদিন আগে, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২২। ১৯৯৯ সালে, তিনি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি কর্তৃক শতাব্দীর সেরা ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হন এবং বিশ শতকের ১০০ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। ২০০০ সালে পেলেকে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফুটবল হিস্ট্রি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস (IFFHS) দ্বারা শতাব্দীর সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়। ১৩৬৩টি খেলায় তাঁর ১২৭৯টি গোল রয়েছে (প্রীতি ম্যাচ সহ)। পেলে পনের বছর বয়সে সান্তোস এবং ষোলো বছর বয়সে ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে খেলা শুরু করেন। তার আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে, তিনি তিনটি ফুটবল বিশ্বকাপ জিতেছিলেন : ১৯৫৮, ১৯৬২ এবং ১৯৭০, এমন কৃতিত্বসম্পন্ন একমাত্র খেলোয়াড়। ১৯৫৮ সালের টুর্নামেন্টের পরে তাকে ও রেই (দ্য কিং) ডাকনাম দেওয়া হয়েছিল। পেলে ৯২ ম্যাচে ৭৭টি গোল করে ব্রাজিলের হয়ে আজও যৌথভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা। ক্লাব পর্যায়ে, তিনি ৬৫৯ খেলায় ৬৪৩টি গোল করে সান্তোসের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন। সান্তোসের সুবর্ণ যুগে তিনি ১৯৬২ এবং ১৯৬৩ সালে কোপা লিবার্তোদোরেস এবং ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে ক্লাবকে নেতৃত্ব দেন। ফুটবলের সাথে ''দ্য বিউটিফুল গেম'' শব্দগুচ্ছকে যুক্ত করার কৃতিত্ব মূলত তাঁরই। ১৯৫৮ বিশ্বকাপে তার উত্থান, যেখানে তিনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ বিশ্ব ক্রীড়া প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন। পেলের জন্ম ২৩ অক্টোবর ১৯৪০ সালে, তিনি ছিলেন দুই ভাইবোনের মধ্যে বড়। বিখ্যাত আমেরিকান আবিষ্কারক টমাস এডিসনের নামানুসারে তার নামকরণ করা হয়। ডাকনাম ছিলো ''ডিকো''। তিনি তার স্কুলের সময়কালে ''পেলে'' ডাকনাম পেয়েছিলেন। দাবি করা হয়, তাঁকে এটি দেওয়া হয়েছিল তার প্রিয় খেলোয়াড়, স্থানীয় ভাস্কো দা গামা গোলরক্ষক বিলের নামের ভুল উচ্চারণের কারণে, যা তিনি নিজেই করেছিলেন। পেলে বলেছিলেন যে তিনি এই নামের অর্থ কী তা জানেন না এবং তার পুরানো বন্ধুরাও জানেন না। পেলে সাও পাওলো রাজ্যের বাউরুতে দারিদ্র্যের মধ্যে বেড়ে ওঠেন। চা দোকানে কাজ করে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর বাবা তাঁকে খেলতে শেখান, তাঁর একটি ভালো ফুটবলও ছিল না, মোজায় কাগজ ভরে ফুটবল খেলতেন। ১৯৫৬ সালে, ডি ব্রিটো পেলেকে পেশাদার ক্লাব সান্তোস এফ সিতে যোগদানের জন্য সাওপাওলোর কাছে অবস্থিত একটি শিল্প ও বন্দর শহর সান্তোসে নিয়ে যান। ক্লাবের পরিচালকদের বলেছিলেন যে, ১৫ বছর বয়সী এই ছেলেটি ''বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় হবেন''। পেলে এস্তাদিও ভিলা বেলমিরোতে তার ট্রায়ালের সময় সান্তোস কোচ লুলাকে আকৃষ্ট করেছিলেন এবং পেলে ১৯৫৬ সালের জুন মাসে ক্লাবের সাথে একটি পেশাদার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। পেলেকে ভবিষ্যতের সুপারস্টার হিসেবে স্থানীয় মিডিয়ায় বিশেষ প্রচার করা হয়েছিল তিনি ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬-এ করিন্থিয়ানস দে সান্তো আন্দ্রের বিপক্ষে ১৫ বছর বয়সে তাঁর সিনিয়র দলে অভিষিক্ত হন। ৭-১ জয়ে দুর্দান্ত খেলেছিলেন। এই ম্যাচে তাঁর দুর্দান্ত কেরিয়ারের প্রথম গোলটি করেছিলেন। ১৯৫৭ মরশুম শুরু হলে, পেলেকে প্রথম দলে একটি শুরুর স্থান দেওয়া হয় এবং ১৬ বছর বয়সে তিনি লীগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হন। পেশাদার হিসেবে স্বাক্ষর করার দশ মাস পর, তাঁকে ব্রাজিল জাতীয় দলে ডাকা হয়। ১৯৫৮ এবং ১৯৬২ বিশ্বকাপের পর, রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস ইন্টারমিলান এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মতো ধনী ইউরোপীয় ক্লাবগুলি তাঁকে সই করানোর জন্য বৃথা চেষ্টা করেছিল। সান্তোসের সবচেয়ে সফল কোপা লিবার্তাদোরেস মৌসুম শুরু হয়েছিল ১৯৬২ সালে; দলটি ফাইনালে আগের বছরের চ্যাম্পিয়ন পেনারোলের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হয়। প্লে অফ ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবের হয়ে পেলে দুটি গোল করেন। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোরার হন। ১৯৬৯ সালে, নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধে জড়িত দুটি দল ৪৮ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিল যাতে তারা লাগোসে পেলের একটি প্রদর্শনী খেলা দেখতে পারে। সান্তোস লাগোসের পাশের স্টেশনারী স্টোরস এফসি-এর সাথে ২-২ গোলে ড্র করে এবং পেলে গোল করেন। এই খেলার পর গৃহযুদ্ধ আরো এক বছর চলে। সান্তোসে থাকাকালীন, পেলে জিটো, পেপে এবং কুটিনহো সহ অনেক প্রতিভাধর খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলেন। সান্তোসে পেলে ১৯তম মরশুম কাটিয়ে, ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ছেড়ে দেন। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বার্সেলোনার লিওনেল মেসি রেকর্ড ভাঙবার আগে পর্যন্ত সান্তোসের হয়ে পেলের ৬৪৩ গোল ছিল একটি একক ক্লাবের হয়ে করা সর্বোচ্চ গোল।

লিউ ইয়র্ক কসমস ঃ পেলে ১৯৭৩ সালে হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের অনুরোধে নিউইয়র্ক কসমস-এ যোগদান করেন। ১৯৭৪ সালের পর পেলে ব্রাজিলিয়ান ক্লাব ফুটবল থেকে অবসর নেন। ১ অক্টোবর ১৯৭৭-এ, কসমস এবং সান্তোসের মধ্যে একটি প্রদর্শনী ম্যাচে পেলে অবসর নেন। পেলের বাবা এবং স্ত্রী উভয়েই ম্যাচটিতে উপস্থিত ছিলেন, সেইসাথে মোহাম্মদ আলী এবং বব মুর। খেলা শুরুর আগে দর্শকদের কাছে একটি বার্তা প্রদান করা—''জীবনে আমরা যা নিতে পারি তার চেয়ে ভালোবাসা বেশি গুরুত্বপূর্ণ''—পেলে প্রথমার্ধে কসমসের সঙ্গে খেলেন, দ্বিতীয়ার্ধে সান্তোসের সঙ্গে। খেলাটি কসমস ২-১ ব্যবধানে জয়ের মাধ্যমে শেষ হয়, পেলে তাঁর জীবনের শেষ গোলে কসমসের হয়ে ৩০ গজ দূর থেকে ফ্রি-কিক-এ গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের সময়, এটি বৃষ্টি শুরু হয়, একটি ব্রাজিলিয়ান সংবাদপত্র পরের দিন শিরোনাম দিয়ে বেরিয়ে আসতে প্ররোচিত করে : ''এমনকি আকাশও কাঁদছিল।''

আন্তর্জাতিক ফুটবলে পেলে ঃ ১৯৫৮ সালে বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ডের তৃতীয় ম্যাচ সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপক্ষে তাঁর প্রথম ম্যাচ ছিল। তিনি সেই সময়ে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন। সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে, হাফটাইমে ব্রাজিল ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল, এবং তারপরে পেলে হ্যাটট্রিক করেন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় এমনটি করেন। চিলিতে ১৯৬২ বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে, মেক্সিকোর বিপক্ষে, পেলে দ্বিতীয় গোলটি করেন, চার ডিফেন্ডারকে পেছনে ফেলে। ব্রাজিল ২-০ গোলে এগিয়ে যায়। পরের ম্যাচে চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে দূরপাল্লার শটে চোট পান। এর ফলে তিনি বাকি টুর্নামেন্টে খেলতেই পারেননি। গ্যারিঞ্চাই প্রধান ভূমিকা পালন করেন। সান্তিয়াগোতে ফাইনালে চেকোস্লোভাকিয়াকে হারিয়ে ব্রাজিলকে তাদের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ শিরোপা দেন। ১৯৬৬ সালে পেলে, জোয়ারজিনহো, গ্যারিঞ্চা, গিলমোর সমৃদ্ধ ব্রাজিল সেরা দল ছিল। কিন্তু তিন ম্যাচ খেলে ব্রাজিল বিদায় নেয়। নৃশংস ফাউলের বিশ্বকাপ ছিল এটি। রেফারির সিদ্ধান্ত ছিল ভুলে ভরা। পেলে একসময় ভেবেছিলেন যে আর বিশ্বকাপ খেলবেন না, পরে মত পাল্টান। ১৯৭০-এ প্রথম ম্যাচে চেক দলকে ৪-১ গোলে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১-০ গোলে (যে ম্যাচে পেলের শট গর্ডন ব্যাংকস আটকে দেন, আজও তাকে বলা হয় 'সেভ অত দ্য সেঞ্চুরি'), রোমানিয়ার বিরুদ্ধে ৩-২, কোয়ার্টার ফাইনালে পেরুকে ৪-২ গোলে, সেমিফাইনালে উরুগুয়েকে ৩-১ হারায়। মেক্সিকো সিটির অ্যাজতেকা স্টেডিয়ামে ব্রাজিল ফাইনালে ইতালির সাথে খেলে। ইতালীয় ডিফেন্ডার টারসিসিও বুর্গনিচ এর সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে হেড দিয়ে প্রথম গোলটি করেন পেলে। জুলে রিমে ট্রফি চিরকালের জন্য জিতে নেয় ব্রাজিল ৪-১ গোলে। পেলে টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে গোল্ডেন বল পেয়েছিলেন। পেলের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছিল ১৮ জুলাই ১৯৭১ সালে রিও ডি জেনেরিওতে যুগোস্লাভিয়ার বিপক্ষে। পেলের খেলা ম্যাচে ব্রাজিল দলের রেকর্ড হলো ৬৭টি জয়, ১৪টি ড্র এবং ১১টি পরাজয়। পেলে এবং গ্যারিঞ্চা উভয়েই খেলার সময় ব্রাজিল কখনোই একটি ম্যাচে হারেনি।

অন্য পেলে ঃ সারা বিশ্বে ফুটবলের প্রসার ঘটিয়ে ছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা। স্বভাবতই শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য এই খেলাটিকে নিয়ন্ত্রণ করত। এমতাবস্থায় লাতিন আমেরিকার উত্থান একটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করে। উত্তর আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা, ওশিয়ানিয়ায় উপনিবেশগুলি ছিল মূলত ব্রিটিশ, ফরাসী ও জার্মানির। সেখানে লাতিন আমেরিকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ফলে এই অঞ্চলের পুঁজিবাদের বিকাশ এবং দেশীয় প্রতিরোধের ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরই প্রেক্ষাপটে পেলে এবং সমসাময়িক ব্রাজিলের উত্থান বিশ্বব্যাপী উপনিবেশবাদ এবং বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে অনুপ্রেরণা জোগায় তথা কৃষ্ণাঙ্গ মুক্তি আন্দোলনকে শক্তিশালী করে। এমনকি খেলা ছেড়ে দেওয়ার পরেও পেলে লাতিন আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ভয় পাননি পেলে। লাতিন আমেরিকায় যেহেতু পুঁজিবাদের ধারা কিছুটা পৃথকভাবে অগ্রসর হয়, তাই ভূমিদাস ও ক্রীতদাস প্রথা এখানে অনেকদিন ছিল। আফ্রিকার এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে এখানে আনা হয়েছিল দাস হিসেবে। সেই নিপীড়িতদেরই উত্তরসূরী পেলে। ১৯৫০-এর দশকে যখন ক্রিকেট মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, তখনই ফুটবল মাঠে পেলে, সঙ্গীতে বব মার্লে বা পল রবসন, বর্ণবৈষম্য ও শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতীক হয়েছেন। সারা দুনিয়া ব্যাপী পেলের নেতৃত্বে স্যান্টোস দলের ভ্রমণ একদিনে বড় পুঁজির দেশকে ফুটবল সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে বাধ্য করে। অন্য দিকে পিছিয়ে পড়া গরিব দেশগুলোয় অন্য লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা যোগায়। তাই পৃথিবীর সর্বত্র আজও পেলে, গ্যারিঞ্চা, ইউসেবিও, মারাদোনা মানে সেই নিপীড়িত মানুষেরা, যাঁরা অদম্য, বারংবার হেরেও হতাশ হন না, আবার এগিয়ে আসে, আরও শক্তি নিয়ে, আরও লম্বা লড়াইয়ের জন্য, অচল অনড় জগদ্দল পাথরকে ওপড়াতে।

পেলে মারাদোনা এইভাবেই জীবিত লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে।

পিতার স্মরণেও সাম্প্রদায়িক তাস

গতকাল ৪ঠা জানুয়ারী ২০২৩ ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের জন্যে তার পৈতৃক ভূমি উদয়পুরের জামজুরী এলাকায় আয়োজন করা হয় শান্তি যজ্ঞের। এতে অংশ নিতে ৩রা জানুয়ারী সন্ধ্যায় এলাকায় আনানো হয় রাজ্যের বাইরের সাধু সন্ন্যাসীদের। যদিও অনেক বছর পর হঠাৎ বিধানসভা ভোটের আগে এই উদ্যোগ কেন তা কিন্তু মহকুমাবাসী সহজেই বুঝতে পারে। দেববাবুর প্রধান উদ্দেশ্যটা ছিল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে সহানুভূতি আদায় করে ভোট আদায়। যখন শাসক দল দেখছে সারা রাজ্যে শাসক বিরোধী হাওয়া প্রবল তখন শেষ অস্ত্র ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি। যার পেছনে রয়েছে শাসক দলের অভিভাবক আর এস এস। সেই উদ্দেশ্যে ৩ জানুয়ারী সন্ধ্যায় শাসক দলের দুষ্কৃতীরা এলাকায় সি পি আই (এম) দলের পতাকা ছিঁড়ে ঘটনা শুরু করে। এলাকাবাসী প্রতিরোধ করলে রাজধরনগরের তিনটি সংখ্যালঘু অংশভুক্ত মানুষের দোকান পুড়িয়ে দেয়। পথচলতি মোটরগাড়ি ভাঙা হয়। শহরে প্রচার করে সি পি আই (এম) দল সাধুদের আঘাত করেছে। শহরের জগন্নাথ চৌমুহানিতে শাসক দলের দুষ্কৃতীরা সি পি আই (এম) দলের অঞ্চল অফিসের ভেতর ও বাইরে লাগানো পতাকা অফিসের আসবাব সব বাইরে একজায়গায় জড়ো করে আগুন লাগিয়ে দেয়। সারা রাত পুরো শহর সহ রাধাকিশোরপুর বিধানসভার এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বাইকবাহিনী ঘোরাগুরি করে ভয়ের পরিবেশ বজায় রাখে। প্রশাসন দেখেও না দেখার ভান করে থানার ভেতর নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। যদিও রাজধরনগরের একজন সংখ্যালঘু বাবুল মিঞাকে রাতেই গ্রেপ্তার করে কিছুটা শান্ত পরিবেশ সৃষ্টির অভিনয় করে। পুরো ঘটনাটি যে পরিকল্পিত তা বোঝা যায়। ঘটনার পর শাসক দলের পা চাটা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা প্রচার করে বিপ্লব দেবের পৈতৃক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় সি পি আই (এম) দলের দুষ্কৃতীরা। এটা যে মিথ্যা তা প্রমাণিত হয় যখন জেলাশাসক বলেন, কোনো রাজনৈতিক নেতার বা নেতার পৈতৃক বাড়িতে আগুন লাগানো হয়েছে বলে যা প্রচারিত হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা।

৫ জানুয়ারী সকাল ১১টায় বামফ্রন্ট-এর এক প্রতিনিধিদল এলাকা সফরে যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিধায়ক শ্রী রতন ভৌমিক সি পি আই (এম) দলের জেলা সম্পাদক কম. মাধব সাহা, কম. নিতাই বিশ্বাস, কম. শ্রীবাস দেবনাথ, কম. আয়াতুল্লা, আর এস পি দলের জেলা সম্পাদক কম. ভানু লোধ, কম. শ্রীকান্ত দত্ত, কম. মুলকুস মিঞা প্রমুখ। নেতৃত্ববর্গ বলেন শাসক দল যখন দেখছে সারা রাজ্যে শাসক বিরোধী হাওয়া প্রবল তখন, শেষ অস্ত্র ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি। এসবের পেছনে রয়েছে শাসক দলের অভিভাবক আর এস এস। আগামী বিধানসভা ভোটে বাঁকা পথে জয়লাভ করার জন্যে সারা রাজ্যে এমন আরো ঘটনা ঘটবে। রাজ্যবাসী যেন সজাগ ও সচেতন থাকেন। আগামী বিধানসভা ভোটে যেন উপযুক্তভাবে তার জবাব দেন। শাসক দলকে বুঝিয়ে দেন এটা ত্রিপুরা; উত্তরপ্রদেশ বা বিহার নয়।

উল্লেখ্য যে, শাসক দলের দুষ্কৃতীরা ৪ জানুয়ারী রাতে জেলা কংগ্রেস অফিসের সামনের কংগ্রেস-এর প্রচারমঞ্চেও আগুন লাগিয়ে দেয়। অফিসের ভিতর পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে হামলা চালায়। এই জেলা অফিস থেকে মাত্র ২০ মিটার দূরে রয়েছে আরকেপুর থানা। অথচ থানাবাবুগণ আসেন অনেক পরে। বামফ্রন্ট-এর নেতৃত্ব সেই এলাকাটিও পরিদর্শন করেন। চরম বর্বরতা।

উদয়পুর জেলা কংগ্রেস ভবনে তৈরি জেলা নির্বাচনী প্রধান কার্যালয়ে গতকাল রাতে আগুন ধরিয়ে উল্লাসে মত্ত বিজেপি হার্মাদবাহিনী। এ কাণ্ড দেখে হতবাক উদয়পুর শহরবাসী। এই শহর এমন বর্বরতা দেখেনি আগে। ছিঃ বিজেপি ছিঃ।

আর এস এস-এর কর্মশালার প্রতিবাদে পি এস ইউ'র মিছিল

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের সাসপেনশন এবং অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্যকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। আর এস এস-এর বশংবদ স্বৈরাচারী উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীকে পদত্যাগ করতে হবে, এই দাবিতে আগামী ৪ জানুয়ারি (বুধবার) পি এস ইউ-এর ডাকে বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করা হয়, বোলপুর, বকুলতলা মোড়ে জমায়েত হয়ে পথসভা হয় পরে বকুলতলা মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল করা হয় এবং সেন্ট্রাল অফিস পর্যন্ত বিক্ষোভ মিছিল করা হয় এবং শেষে পথসভার মাধ্যমে বিক্ষোভ সমাবেশ শেষ হয়।

বক্তব্য রাখেন :— সাসপেনশন রত কম. সোমনাথ সোও, কম. নওফেল মহ. সফিউল্লাহ, কম. আদিত্য জোতদার, কম. কৌশিক ভৌমিক, কম. প্রসেনজিৎ দাস, রনজিত প্রামানিক ও আজমের আলী। রবীন্দ্রনাথের সুউচ্চ শিক্ষাভাবনার অনন্য রূপায়ণের ক্ষেত্রকে আর এস এস-এর কর্মশালায় পরিণত করা হচ্ছে। এ বিষয়ে মূল কুশীলব কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচিত উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। তাঁকে অবিলম্বে পদত্যাগ করার দাবি তোলেন ছাত্র নেতৃবৃন্দ।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 5/-